শহীদুল্লা কায়সার

সারেং বৌ

~ এর অনলাইন স্বত্ব ~ www.amarboi.com ~

নওরোজ সাহিত্য সম্ভার প্রকাশিত একটি কালজয়ী উপন্যাস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সারেং বৌ

শহীদুল্লা কায়সার

নওরোজ সাহিত্য সম্ভার
৪৬ বাংলাবাজার ঢাকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

[সম্ভার-২৩]

[গ্রন্থ স্বত্ব] পান্না কায়সার

প্রকাশনায়
বেগম মেহেরউন্নিসা
নওরোজ সাহিত্য সম্ভার
৪৬ বাংলাবাজার
ঢাকা ১১০০

নবম মুদ্রণ
[সম্ভার প্রথম মুদ্রণ]
জুন ১৯৮৮

প্রচ্ছদ
কামরুল হাসান

মুদ্রণে
ই.র.জর্জ
প্রান্তিকা মুদ্রণী
৪৬ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাদেরই উদ্দেশ্যে

তালতমালবনরাজিনীলা সাগরমেখলা বঙ্গভূমির পূর্ব উপকূলে যাদের জন্ম, পৃথিবী যাদের দেশ, সমুদ্রে যাদের অন্ন, তরঙ্গ যাদের খেলার সাথী, কণ্ঠ যাদের সাগরকল্লোল,

ঝড় ওদের ঘর ভাঙে, দরিয়ার বান ভাসিয়ে নেয় ওদের সবকিছু, তবু সাগরের ডাকে মন ওদের আনচান, কেননা ধমনীতে ওদের সেই নির্ভীক আদি-নাবিকের রক্ত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থই থই পানি। নদীর পানি। সাগরের পানি।

চারিদিকে পানি। মাঝখানে ডাঙ্গা। তবু একে দ্বীপ বলে না কেউ। বলে গ্রাম। কেননা এটা পানিরই দেশ।

গ্রামটাকে বলে বামনছাড়ি। নদীটাকে বলে কয়াল।

বামনছাড়ি যেমন গ্রাম হয়েও গ্রাম নয়, জলঘেরা ভূখন্ড, তেমন কয়ালও মামুলি নদী নয়। কয়াল সমুদ্র মোহনার উন্মত্ত জলোচ্ছ্বাস। কয়ালের পারে দাঁড়িয়ে দেখা যায় সমুদ্র, কখনো বা ঝিকিমিকি একটি রুপালী রেখা, কখনো বা স্বচ্ছ নীলের একটি চিকচিকে আভা।

শুধু বামনছাড়ি নয়, সাগর আর মোহনার তীর ঘেঁষে আরও কত গ্রাম—কদুরখিল, পিয়ালগাছা, মাদার টেক। এসব গ্রামে যাদের বাস বিচিত্র মানুষ ওরা। বিচিত্র ওদের জীবিকা। ওদের আছে জমি। সে জমিতে ধান হয়। ওরা চাষ করে। ওদের আছে গোয়াল। সে গোয়ালে থাকে হালের বলদ, দুধের গাই। তবু ওরা সমুদ্রের মানুষ। সমুদ্র ওদের জীবিকা, সমুদ্র ওদের জীবনের গান। সাগর উর্মি ওদের কল্লোল গীত। সাগরের বুকে ডিঙ্গি ভাসিয়ে ওরা মাছ ধরে। সাগরের তরঙ্গে চড়ে ওরা চলে যায় দূরদেশে। ওরা নাবিক।

বামনছাড়ি গ্রামে এমনি এক নাবিক বাড়ী, ওরা বলে সারেংবাড়ী।

সারেংবাড়ীর সারেং বৌ। নাম তার নবিতুন।

সারেংবাড়ীর তিন হিস্যা। উত্তরের হিস্যা। পুবের হিস্যা। বড় হিস্যা। বড় হিস্যা পশ্চিমে হলেও পশ্চিমের হিস্যা নয়। কেননা, ওদের

দুটো বড় বড় ঘর। তার উপর গোয়ালঘর, ঢেঁকিঘর। সারেংবাড়ীর ওটা বড় হিস্যা।

উত্তরের হিস্যা নবিতুনের।

উত্তরের হিস্যার সুমুখে মাঝারি গোছের উঠোন। উঠোনের বাঁ কোণে হিস্যার সীমানা বরাবর বরই গাছ।

ঘর ঝাঁট, হাঁড়ি-পাতিল ধোয়া, হাঁস-মুরগির আদার দেয়া—নবিতুনের নিত্যকার ভোরের কাজ। কাজগুলো সেরে পুকুরে গিয়ে ভাল করে হাত মুখটা ধুয়ে এল নবিতুন। তারপর বসল দাওয়ার দরজায় ঠেস দিয়ে পা গুটিয়ে। এটা অন্য একটা কাজে হাত দেবার পূর্বক্ষণ।

দাওয়ায় বসে বরই গাছটার দিকে নজর পড়ে নবিতুনের। বরই বেরিয়েছে গাছে। গোল গোল ছোট ছোট দানার মতো। ঘন সবুজ। ঘন সবুজ অংকুরগুলোর দিকে চেয়ে থাকে নবিতুন; চেয়ে থাকে স্থির দৃষ্টিতে। চেয়ে চেয়ে বুকটা বুঝি কেঁদে ওঠে। বুকটা ভারি হয়ে যায়। বুকটা ফেটে যেতে চায় কী এক হাহাকারে।

কতবার বরই ধরল। সে বরই পাকল। নিঃশেষ হল। নতুন পাতা গজাল বড়ই গাছে। সে পাতা বুড়িয়ে ফ্যাকাসে হল। শাদাটে হল। সে পাতা শুকিয়ে ঝরে গেল। আবার মরশুম এল। পাতার ফাঁকে ফাঁকে ঘন সবুজ কুলের অংকুর চোখ মেলল।

নবিতুনের বুকটা শুধু নিঃশব্দে কেঁদে যায়। নবিতুনের বুকটা হাহাকারের নিঃশ্বাসে ফেটে ফেটে চৌচির হয়।

নবিতুন, ও নবিতুন, বলি আর কতকাল। লাঠিতে ভর দিয়ে ঠুক ঠুক করে আসে পুবপাড়ার সগির মা। বসে পড়ে দাওয়ায় নবিতুনের পাশে। বলে আবার, আর কতকাল নবিতুন। এবার একটা সাংগা টাংগা কর। জোয়ানকির সুরুজ একবার ডুবে গেলে আবার কি উঠবেরে ?

বয়সের চাপে আর ব্যারামের দাপটে লাঠি ভর দিয়ে কুঁজো হয়ে চলে সগির মা। তাই সগির মা ওকে কেউ বলে না আজকাল, বলে গুজাবুড়ি। গুজাবুড়ি কুটনী বুড়ি, গুজাবুড়ি পুবপাড়ার লুন্দর শেখের কুটনী মাগী, গুজাবুড়ি নবিতুনের নয়ন জ্বালা, গায়ের জ্বালা, গলার বিষ।

ভেবে দেখরে নবিতুন, আমার কথাটা ভেবে দেখ। পালংকে বসে পায়ের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপর পা তুলে খাবি, থুবি, হুকুম চালাবি। হু করবি অমনি হ্যাঁ করে ছুটে আসবে এক গন্ডা দাসীবান্দী। হাত টিপবে পা টিপবে বান্দী। চুল আঁচড়াবে গোসল করাবে বান্দী। এরি নাম না ঘর করা। পানের পিকটা অদ্ভুত কৌশলে ভেতরে ধরে রেখে বলে গুজাবুড়ি। কি এক ধূর্ত চোখে চেয়ে থাকে নবিতুনের দিকে। তারপর ঢক করে গিলে ফেলে পানের রসটা। চর্বিত পানের অবশিষ্টটুকু দাঁতের মাড়ি আর চামড়ার ফাঁকে রেখে দেয় সুপুরির মতো গোটা পাকিয়ে। ফুলিয়ে তোলে নীচের গালটা। নবিতুনের সকালটাই বুঝি মাটি হয়। কত কাজ পড়ে রয়েছে ওর। কিন্তু গুজাবুড়ির ওই শকুনী মুখ দেখলে আর ওই শয়তানী কথা শুনলে না মেজাজ থাকে ঠিক, না মন লাগে কামে।

গুজাবুড়ি, তুই কুটনী, তুই শয়তান, দূর হ তুই। গুজাবুড়ির কোলটা ডিঙ্গিয়ে নবিতুন চলে আসে ঘরের ভেতর। ঘরে এসে গুজাবুড়ির উপর রাগটা ঝাড়ে বেচারি আক্কির পিঠে। দুম দুম দুটো কিল বসিয়ে দেয় ওর পিঠে। চুলের মুঠো ধরে টেনে তোলে ওকে, অলক্ষ্মী মনহুস। ওঠ শীগগির। সেই সকাল থেকে কতবার ডাকছি। তবু যদি ঘুম ভাঙ্গে মেয়ের।

ভ্যাবচ্যাকা খেয়ে যায় আক্কি। কিল আর চুলের টানে বুঝি পানি এসে যায় ওর চোখে।

কোরাটা নিয়ে যা মুন্সীবাড়ী। এক আড়ি ধান দেবে। নিয়ে আসবি। চোখ মুছতে মুছতে কোরাটা হাতে নেয় আক্কি। চোখ মুছতে মুছতেই বেড়িয়ে যায়।

পেছন থেকে আবার ডাকে নবিতুন, যাবার পথে পোস্ট মাস্টারের বাড়ীটা খোঁজ করে যাবি।

মনে মনে হাসে গুজাবুড়ি। পোস্ট মাস্টারের বাক্সে কি আছে আর নেই সে কথাটা মনে করেই বুঝি হাসে। বলে ঃ বিবির সুখে থাকবিরে নবিতুন। বিবির সুখে থাকবি। বৌদের বড় মহব্বত করে লুন্দর শেখ।

মুখে তোর পোকা পড়ুক। জিব তোর খসে পড়ুক। বলে নবিতুন আর থপ থপ করে হাঁটে ঘরের ভেতরে।

সগির মা গুজাবুড়ি, মনে মনে হাসে। প্রথম প্রথম এমনিই হয়। শরম করে। তেজ দেখায়। রাগ দেখায়। রাগের চোটে হাঁড়ি ভাঙ্গে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গালি ছোঁড়ে। তারপর আস্তে আস্তে নরম হয়। টোপ গেলে। একদিন সুড় সুড় করে বেরিয়ে আসে সগির মার পেছন পেছন।

কত দেখল সগির মা। কুলকন্যার কুল দেখল, তেজ দেখল, মান দেখল। সতী বৌর সতীত্ব দেখল। সবই লুন্দর শেখের দাসী বান্দীর খেদমতের লোভ, দু-পদ জেয়ড়, বড় জোড় কিছু নগত টাকার কাছে গাঙের পানি। গাঙের পানির মতোই ভেসে যায়। কত দেখল সগির মা।

সগির মা হাসে মনে মনে। বলে ঃ তা তুই যা খুশী মুখ কর নবিতুন। আমার তো দিল পোড়ে তোর লাগি। তোর 'শরীলে' যে ঢল ঢল জোয়ানকির জোয়ার। এ ঢল যে 'বিরথাই' যায় নবিতুন।

আহ্ কুটনী বুড়ী। বের হ। বের হ তুই। মেয়ে খাগী ছেলে খাগী খসম খাগী। তোর মুখ দেখলে পাপ। তোর কথা শুনলে পাপ। রাগটা বুঝি আর ধরে রাখতে পারে না নবিতুন।

সগির মা বেওয়া। সগির বাপ, সগি আর সগির ভাইটি একে একে কবে যে মারা গেল সেটা আজ তারই মনে পড়ে না। এই অলক্ষ্মীর জীবনটা নিয়ে কত টিটকিরি টিপ্পনী শুনতে হয় ওকে। সে সব গা-সওয়া সগির মার।

মনে মনে হাসে সগির মা। লাঠিতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ায়; বলে, সগির মার ভাল কথায় তো মন লয় না তোর। 'কিন্তুক' এই যে এদ্দিন ধরে বলছি সারেং আসবে না, আসবে না—কই এলো সারেং? বিদেশের সোয়াদ পেয়েছেরে, বিদেশে সোয়াদ পেয়েছে সারেং। বিদেশের সোয়াদ যে পায় সে কখনো দেশে ফিরে না।

একখানা পিঁড়ি ধাঁ করে এসে চলে গেল সগির মার কান ঘেঁসে। উঠোনের মাটিতে ঠনঠন দিয়ে ওঠে পিঁড়িটা।

এবার আর শুধু মনে মনে হাসে না সগির মা, অনেক পাপ অনেক কুটনামীর রেখা-জাগা লোল চর্ম মুখটাও হেসে ওঠে। লাঠির ঠুক-ঠুক শব্দ তুলে চলে যায় সগির মা। যেতে যেতে বলে—ভেবে দেখরে নবিতুন, ভেবে দেখ। জোয়ানকির ঢলটা গেলে পর পস্তাবি। পস্তানই সার হবে তখন—পাঁচ বৌ লুন্দর শেখের। পাঁচ বৌর মাঝে তুই হবি-রাণী, রাণীর সুখে থাকবি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খসম খাগী ছেলে খাগী কুটনী মাগী...নিজের মনেই গজ গজ করে নবিতুন। ওই শয়তানী বুড়ি শুধু সকাল নয় গোটা দিনটাই বুঝি মাটি করে দিয়ে গেল ওর।

গতকালকার আঁকাড়া চাল আর একটা কুলো নিয়ে নবিতুন বেরিয়ে আসে উঠোনে। সগির মাকে ছুঁড়ে মারা পিড়িখানাই টেনে বসে যায় চাল ঝাড়তে।

কি হল নবিতুন বুয়া ? বড় হিস্যার শরবতি কাছে এসে শুধায়।

উত্তরে শুধু চিবুক বেঁকিয়ে মুখের আদলে রোষ ফোটায় নবিতুন। কুলোর পিঠে চটাঠ চটাঠ শব্দ তোলে আঙ্গুলের। ঝাড়া চালগুলো রাখে কোরায়। তুষ আর কুড়োগুলো তুলে নেয় মালসায়। তার যেন এক রুদ্ধ বাতাস আচমকা ছাড়া পেয়ে ভয় করে বেরিয়ে গেল মুখ দিয়ে, সেই সাথে শব্দটা গুজাবুড়ি।

সে তো দেখলাম। তা ওর বাঁকা কোমরটা একেবারে ভেংগে জন্মের মতো অকম্মা করে দিলেই হয়। বলে শরবতি।

মেরেছিলাম পিঁড়িটা, লাগল না গায়।

তুষের মালসাটা ঘরে রেখে আসে নবিতুন। কাঁখে তুলে নেয় চালের কোরাটা। শরবতির মুখের উপর মিনতির দুটো চোখ রেখে বলে, শরবতি বোন, হাতটা একটু লাগাবি। আর একটা ঝাড়া দিলেই ঠিক ঠিক হয়ে যায় চালগুলো। এ চাল চৌধুরী বাড়ী গেলে হাঁড়ি চড়বে আমার। নবিতুন বুয়া, তুমি খালি শরম দাও। বলেছিই তো যখন দরকার পড়বে ডাকবে আমায়। ঢেঁকিঘরের দিকে পা তোলে শরবতি।

আসলে ঢেঁকিঘর বলে আলাদা কিছু নেই নবিতুনের। কুল্লে একটি মাত্রই ঘর ওর। হাত কুড়ি লম্বা মাঝামাঝি বেড়া দিয়ে দুভাগ করা। এক ভাগে ঢেঁকি, চুলো, মাচাং সবই; একাধারে ঢেঁকিঘর, রসুইঘর, হাঁস মুরগীর খোয়াড়। বাকী আর্ধেক থাকার! তবে দু অংশেই বাইর থেকে দুটো আলাদা দরজা। সারেং বৌ নবিতুন, ঢেঁকির উপরও যেন সুসঙ্গত এক তালের ছন্দ, নাচের ঝংকার। খলখলিয়ে হাসে ও খলখলিয়ে নাচে ওর যৌবন পুষ্ট শরীরখানি। ঢেঁকির উপর যেন নেচে চলেছে বিজলীর মেয়েটি নবিতুন, পা দেখা যায় না, এমনি দ্রুত ওঠে আর নাবে ওর পা। আর সেই পায়ের আঘাতে ঢেক্‌কুর ঢুক কলকলিয়ে যায় ঢেঁকিটা। চালগুলো সব খোলার উপর খইয়ের মতো লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে ছিঁটে ভিঁটে যায় চারদিকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাল রাখতে গিয়ে হিমসিম খায় শরবতি। এক হাতের জায়গায় দু'হাত লাগায়। 'গাইলের' উপর থেকে ছিটিয়ে পড়া চালগুলো জড় করে, ভার দেয় 'গাইলের' মুখটা। ইস্পাতের খাড়ু পড়া মোলাটার দ্রুত উঠতি পড়তির মুখে সাবধানে রাখে হাতখানি।

এর মাঝেও রসিকতা করে শরবতি। সাধে কি চোখ লেগেছে লুন্দর শেখের। নবিতুন বুয়া, তোর গায়ে যে জোয়ানকির ঢল। আমারই চেয়ে থাকতে ইচ্ছা করে।

শুনে যেন ফুর্তি আরো বেড়ে যায় নবিতুনের। মাথাটা ঝাঁকিয়ে কোমড়খানি দুলিয়ে ঢেউটির মতো ঢলকে পড়ে ঢেঁকির উপর। যুগির বানানো মোটা শাড়ীখানাও ধরে রাখতে পারে না ওর ছলকে ঝলকে উছলে পড়া জোয়ানকি। বাঁধন মানে না নিতম্ব দোলা। শাসন মানে না জোড়া বুকের উদ্দাম নাচন। সারেং বৌর দেহের ভাঁজে ভাঁজে এ বুঝি জোয়ান-কির উথালি পাথালি নাচন, কলকল জোয়ার। আর সেই নাচের ছন্দে দ্রুত বোল তুলে যায় ঢেঁকিটা—ঢেক্‌কুর ঢুক ঢেক্‌কুর ঢুক।

নবিতুনের পায়ের তলায় যদি একটুখানি সুখ পায় ঢেঁকিটা, 'কিলা' দুটো ক্যাঁক ক্যাঁক কেঁদে যায়। থর থর কেঁপে যায় মাটিটা।

অবশেষে এক রকম নাস্তানাবুদ হয়েই বলে শরবতি, নবিতুন বুয়া, এবার একটু থাম।

থেমে যায় নবিতুন। থেমে যায় সুনিতম্ব দোলা। বার বার বিদ্রো-হের ভঙ্গিতে দুলে কেঁপে স্থির হয় বুকের সেই এক জোড়া নরম অবাধ্যতা।

আড়ায় হাত রেখে দু'হাতের ফাঁকে মুখটাকে ছেড়ে দেয় নবিতুন। ওর গোটা শরীরটা যেন ঝুলে রয়েছে আড়ার উপর রসচিকন একখানি লতার মতো। বারা বান্দাটা তো আর সত্যি নাচের ভঙ্গিতে একটুখানি হাত পা দুলিয়ে যাওয়া নয়। 'বারা বান্দা' পরিশ্রমের কাজ, মেহনতের কাজ। অতবড় আর ভারি ঢেঁকিখানাকে টলাতে পায়ের জোর গায়ের জোর সবই ঢেলে দিতে হয়। আড়ায় মুখ রেখে ঘন ঘন নিঃশ্বাস নেয় নবিতুন। দূর করে ক্লান্তিটা। ওর কপালে আর নাকের ডগায় মুক্তোর মতো শাদা শাদা ঘামের বিন্দু।

'গাইলের' ভেতর থেকে চাল তুষ তুলতে তুলতে আড়চোখে ওকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখে শরবতি। বলে, লুন্দর শেখের নজর আছে। রসাল জিনিসেই চোখ লাগিয়েছে ও। নবিতুন বুয়া, সাবধানে থাকিস কিন্তু।

সারা সকালে বুঝি এই প্রথম একটু হাসল নবিতুন। স্বেদ-মুক্তোর ফোঁটা আঁকা মুখখানি ওর ছোট্ট একটা হাসির ঝিলিক তুলে যায়। বলে নবিতুন, নিজের দিকে চেয়ে দেখিস কখনো? দিনে দিনে যে শরবতের মতো মিঠা হয়ে উঠেছিস। লুন্দরের কিন্তু সখ আবিতি মেয়ে। শরবতি, বুঝে সমঝে চলিস। আবিতি অর্থাৎ কুমারী মেয়ে শরবতি। নিজেকে নিয়ে রসিকতায় তাই এখনো ওর লজ্জা। তাড়াতাড়ি মুখটা নাবিয়ে নেয় শরবতি। কোষ ভরে কাঁড়া চালগুলো তুলে নেয় কোরায়। তুলতেই বলে, হুঁ, সখ না আরো কিছু, আসুক না, খেরের নেড়ায় আগুন ধরিয়ে পুড়িয়ে দেব না ব্যাটার মুখটা? শরবতির রাগের ঠমক দেখে হাসে নবিতুন। হাসতে হাসতে আড়া ছেড়ে নেবে আসে ও। একবার ধপাস আর একবার ক্যাঁক করে যেন হাঁফ ছাড়ল ঢেঁকিটা। হাঁফ ছেড়ে মাটিতে মুখ রাখল ঢেঁকিটা।

সেই যে কোরা নিয়ে গেল মুন্সীবাড়ী এখনো ফেরে না কেন আক্কি? বুঝি আক্কিকে দেখবার জন্যই উঠোন পেরিয়ে রাস্তাটার উপর একবার চোখ বুলিয়ে এল নবিতুন।

তারপর কাঁড়া চালগুলো ঝাড়ল, নিজের মেহনতের পাওনা এক সের চাল পৃথক করে রাখল। বাকী চাল কোরায় তুলল। খুদ আর তুষ আলাদা মালায় পুরে নিল।

যেন মস্তবড় অপরাধ করেছে তেমনি কুণ্ঠিত পায়ে কাছে এসে দাঁড়ায় আক্কি। ওর হাতের শূন্য কোরাটার দিকে তাকিয়ে যেন ছাৎ করে ওঠে নবিতুনের বুকটা।

কিরে, ধান আনলি না? শুধায় নবিতুন।

না, ভূইয়ার হাটে কল বসেছে। এখন থেকে সেই কলেই নাকি সবাই ধান ভানবে। মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থেমে যায় আক্কি।

পোস্ট মাস্টারের কাছে যাসনি?

চিঠি নাই, টাকা নাই, কিচ্ছু নাই।

কিচ্ছু নাই? রোজই তো শোনে নবিতুন, কোন খবর নাই। তবু কি এক হতাশায় যেন ভেংগে পড়ে ও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আক্‌কির চোখ এখন মায়ের দিকে নেই। শূন্য কোরাটা মাটিতে রেখে মালসা থেকে এক মুঠ খুদ তুলে নিয়েছে ও। খিদের চন চন করছে ওর পেটটা, চিবোতে চিবোতেই আগের কথার বাকী কথাগুলো শেষ করে ও। মা, মুন্সীরা বলে কি? বলে, কলে নাকি খুব সাফ হয়, সাদা হয় চাল। ভাত হয় সাফ সাফ, সোন্দর সোন্দর।

অন্যদিন হলে না বলে ওই এক মুঠো খুদ খাওয়ার জন্য গোটা কয় কিল পড়ত আক্‌কির পিঠে। নিদেনপক্ষে কিছু বকুনী। কিন্তু আজ ওর পিঠে হাত বুলিয়ে দিল নবিতুন। বলল, বাসনে পান্তা আছে, খেয়ে নেগা। খোরায় লংকা পোড়া আছে একটা নিবি বেশী নিবি না। খুশির চোটে লাফাতে লাফাতে ঘরে চলে যায় আক্‌কি। পান্তাটা দাওয়ায় এনে খেতে বসে, ওর খাওয়ার দিকে চেয়ে থাকে নবিতুন। মনটা ভারি হয়ে আসে নবিতুনের। সকাল বেলায় খামোখাই মেরেছে মেয়েটাকে।

প্রতিদিনকার সেই ভাবনাটি আবার বুঝি একশো হাত মেলে ঘিরে ধরে নবিতুনকে। কেন? কেন কোন খবর আসে না লোকটার? চিঠি আসে না, টাকা আসে না। কোন লোকের মুখেও খারাপ ভাল একটা খবর পাওয়া যায় না। এমন তো হয়নি কখনো?

সেই বার বছর বয়সে বিয়ে হয় নবিতুনের। আর এখন, তা প্রায় এক কুড়ি পেরিয়েও বছর তিনেক হতে চলল বই কি? এর মাঝে—কতবার বিদেশ করতে গেল মানুষটি। এক নাগাড়ে দু' বছর, একবার মাত্র তিন বছর থেকেছে বিদেশে। মাঝে মাঝেই চিঠি এসেছে, টাকা এসেছে প্রতি তিন মাসে। তারপর একদিন ফিরে আসত লোকটি। রঙ্গীন শাড়ী, ফুলের তেল, গন্ধ সাবান আরো কত কি নিয়ে আসত নবিতুনের জন্য। এমনি কতবার বিদেশ করতে গেল আবার ঠিক দু'বছর বাদ ফিরে এল। কিন্তু এবার কি হল। গেছে সেই যেবার মুরগির মরক লাগল গ্রামে—সেই বছর। তারপর দু'বছরের জায়গায় তিনটি বছর কেটে গেল, না একটা খবর, না একখানা চিঠি। এমন তো হয়নি কখনো?

তবে? কি এক আশংকায় ধুক করে ওঠে নবিতুনের বুকের ভেতরটা। অসুখ-বিসুখ বা তার চেয়েও মারাত্মক কিছু? আল্লায় না করুক, অমন আশংকা মনের ভেতর ঠাঁই দেয় না নবিতুন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হঠাৎ সেই মেয়ে খাগী ছেলে খাগী খসম খাগী গুজাবুড়ির শয়তানী মুখটা ভেসে ওঠে নবিতুনের চোখের সুমুখে। কানের কাছে যেন কিল-বিলিয়ে ওঠে সেই শয়তানী কথাটা—সারেং আসবে নারে, আসবে না। বিদেশের সোয়াদ যে পায়, সে কখনো দেশে ফেরে না।

নবিতুন বিশ্বাস করে না এসব কথা। কখনো বিশ্বাস করবে না। সারেং তার অমন লোকই নয়।

অবশ্য গুজাবুড়ি ছাড়াও আরো লোকের মুখে শুনেছে নবিতুন, লোকদের জন্য বিদেশের পথে নাকি শুধু ফাঁদ। সে ফাঁদে আটক পড়ে এ দেশের জাহাজী। ফাঁদের মায়ায় ভুলে যায় দেশের কথা। সাদী করে। ঘর করে বিদেশিনীর। ধীরে ধীরে বিদেশিনীর যাদুতে মন যায় বদলে। মন থেকে মুছে যায় আপন দেশের ফেলে আসা 'আবাগী' বৌটির স্মৃতি।

নবিতুনের জানা মতে এমন ঘটনা যে একেবারে নেই তা তো নয়। এই বামনছাড়ি গ্রামের মিজি বাড়ীর ছেলে রইসুদ্দি, সেই যে গেল জাহাজের সুকানি হয়ে আর ফেরেনি। নবিতুন শুনেছে অনেক সাগর পেরিয়ে বহুত দূরে নাকি সাদা সাহেবদের দেশ। সেই সাদা সাহেবের দেশে থাকে মেম নামের যাদুকরীরা। সেই এক মেম নামের যাদুকারীর ফাঁদে বন্দী হয়েছে রইসুদ্দি।

বামনছাড়ি গ্রামে ওই এক রইসুদ্দি ছাড়া অন্য কোন নজির নেই। কিন্তু লোকে বলে, বামনছাড়ির গাঙ পার থেকে শুরু হয়েছে কদুর খিল, তারপর যে পিয়ালগাছা, সে সব গ্রামে নাকি এমন ঘটনা 'আকসার' ঘটছে।

এ সব কথা যারা বলে তাদের যে একেবারে অবিশ্বাস করতে পারে না নবিতুন। শরবতির বড় ভাই, এই কিছুদিন আগ পর্যন্ত সেও তো দেশ-বিদেশ করত ওই জাহাজেরই কাজে। পুবের হিস্যার কোরবান, সেও তো সারেংয়ের কাম করেছে কমছে কম করেও দশটি বৎসর। তা ছাড়া বামনছাড়ি, মাদার টেক সেই দিন পর্যন্ত এসব গ্রামের অর্ধেক লোকেই তো পড়ে থাকত জাহাজের কাজে বিদেশে। এখন ওরা যেতে পারে না। বিদেশগামী জাহাজে কাজ পেতে হলে যেতে হয় হিন্দুস্তানে—কোলকাতায়। সে নাকি বড় ঝামেলার ব্যাপার। হিন্দুস্তান, কোলকাতা এখন বিদেশ, বড় কড়াকড়ি সেখানে। তাই জাহাজের কাজে ক্ষান্ত দিয়ে ওরা এখন ক্ষেতি গেরস্তালিতেই মন দিয়েছে, পালদের জমি চাষ করছে ভাগে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওদের কথা ষোল আনা না হলেও আট আনা বিশ্বাস করে নবিতুন। কিন্তু কদম সারেং কি সেই জাতের মানুষ? না, কেউ কসম খেয়ে বললেও বিশ্বাস করবে না বিশ্বাস করবে না নবিতুন। মেম মায়াবিনীর ফাঁদে পা দেবে তেমন মানুষই নয় কদম সারেং।

মনে পড়ে নবিতুনের। নবিতুনের সারেংটি তখন অনেক দেশে 'ঘোরনা' দিয়ে, অনেক ভাঁটি অনেক জোয়ারের পানি ভেঙ্গে ফিরে এসেছে, নবিতুনের বুকের সায়রেই নোঙ্গর ফেলেছে।

বাপের কাছে রইসুদ্দির চিঠি এসেছে, টাকা এসেছে। সেই সাথে এসেছে ওর মেম যাদুকরীর 'ফুটু'।

ফটো দেখে তো তাজ্জব নবিতুন।

ওমা এই ফুটু! ডাইনী না বেবুশ্যে গো? দেখো না কেমন ছিনালী হাসি, তা আবার মরদটার কাঁদে হাত রেখে কি ঢলাঢলি।

মা গো, কি বেশরম বেহায়া বেলাজ। শরমে বুঝি মরে যায় নবিতুন, তবু উল্টিয়ে পাল্টিয়ে দেখে ফটোটা। উল্টিয়ে দেখে বুঝি ঘিন ঘিন করে নবিতুনের গাটা। নাক কুঁচকায়, চোখ উল্টায়।

ওমা! সাহেব দেশের মেম ডাইনীগুলো ন্যাংটা থাকে নাকি গো। মাথার নেই ঘোমটা, গায় নেই কাপড়। অর্ধেকটা উরু খোলা। ছিঃ ছিঃ। রইসুদ্দি শেষে এমন ছিনালীর খপ্পরে পড়েছে।

নবিতুনের ভাবসাব দেখে মুচকি মুচকি হাসে কদম। ভাবে, ফটো দেখেই এই অবস্থা নবিতুনের। মেমদের কান্ডকারখানা যদি চোখে দেখত তবে বুঝি মূর্ছা যেত নবিতুন।

নবিতুন তখনো বলে চলেছে, ওরে বাবা! এদিক নেই আবার সেদিক আছে। বেবুশ্যের মতো ন্যাংটা, ওদিকে পায়ে 'জোতা' 'জোতা'র' সাথে ফের মোজা। ইস, ছিনালের কত ঠাম! তারপর ঘেন্নার সাথে ফটোটা ফেরত দিয়েছিল নবিতুন।

রইসুদ্দির ভাইর বেটি ফটোটা নিয়ে চলে গেলে পর আস্তে আস্তে বলল কদম, মেমগুলোকে যত খারাপ ভাবছিস, ওরা অত খারাপ নয়রে নবিতুন। এ্যা, যেন আচানক একটা ধাক্কা খেয়ে ঢেঁকি থেকে পড়ে গেল নবিতুন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওই ডাইনীগুলোকে ভাল বলল কেন সারেং? কোরবানের বৌ হাসমতি। হাসমতি বলে, সব এক গোয়ালের গরুরে, এক গোয়ালের গরু। বিদেশে ওরা কি যে করে আর কি না করে, তার কোন ঠিক ঠিকানা আছে? কোরবানকে একটুও বিশ্বাস করে না হাসমতি।

তবে কি হাসমতির কথাটা ঠিক? কদম, কোরবান, শরবতির ভাই, একই জাহাজে তো ঘুরেছে ওরা। তখন কি ওদের মতো কদম সারেংও ডাইনীগুলোর সাথে গা ঢলাঢলি করেছে?

না না, নবিতুনের সারেং অমন লোকই নয়। কদমের দিকে চোখ করে বলে নবিতুন, না গো না ওরা ভাল না। নবিতুনের আতংক আর দুশ্চিন্তা আঁকা মুখের দিকে চেয়ে আবারও মুচকি মুচকি হাসে কদম। বলে, ভাল, ভাল বললাম কইরে? বললাম, যতটা ভাবছিস তুই আসলে অতটা খারাপ নয় ওরা।

না, ওরা খারাপ। অমন বেহায়া, বেবুশ্যার মত ন্যাংটা আর অমন ছিনালী ঢং—ওরা খারাপ।

আচ্ছা খারাপ। ওর কথাটা মেনে নিয়ে ওকে বুকের কাছে টেনে নেয় কদম। আলগা হয়ে আসে নবিতুন। বলে—হ্যাঁগো, তুমি ওদের থেকে দূরে দূরে থাক তো? ওরা কিন্তু যাদু জানে, অনেক মন্তর জানে। হুঁ, ছোট্ট করে বলে আবারও মুচকি হাসে কদম।

কদমের মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝি সংশয়মুক্ত হয় নবিতুন। কেন যেন মনে হয় নবিতুনের, সব সময়ই মনে হয়, লোকটার মুখ দেখেই ও বুঝে নিতে পারে লোকটার মনের কথা, আসল কথা। তবু বলল নবিতুন, খোদার কসম? খোদার কসম। কসম খেয়ে রীতিমতো গম্ভীর হয়ে গেল কদম।

এতক্ষণে বুঝি পুরোপুরি আশ্বস্ত হল নবিতুন। তারপর, সকাল বেলায় ঘরের চাল থেকে যেমন ঝরে পড়ে শিশিরের ফোঁটাটা তেমনি টুপ করে ও ঝরে পড়ল কদমের বুকে। কদমের বুকে মুখ গুঁজে ফিসফিসিয়ে বলল, সারেং গো সারেং। সব সময় দূরে দূরে রেখ ওদের। বড় বজ্জাত ওরা। দু' বাহুতে নবিতুনকে কচলে দলে একাকার করে সেদিন বলেছিল কদম সারেং, হ্যাঁরে হ্যাঁ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিড় বিড় করে গাল পাড়ে নবিতুন। গুজাবুড়ি, খানকি মাগী, কুটনী, ছিনাল। ওর মায়ের জন্মের ঠিক নেই, ওর নিজের জন্মের ঠিক নেই। মনে মনে স্থির করে নবিতুন, এবার উঠোনটার আশেপাশে দেখলেই দা লয়ে তাড়া করবে গুজাবুড়িকে। ইবলিসের দোসর গুজাবুড়ি, কানে কানে তার কুমন্ত্রণা।

যাদুকারীর ফাঁদে পা দিয়ে বিদেশের মধুতে ডুবে থাকবে তেমন লোকই নয় নবিতুনের কদমটি। আবার যদি এমন কথা মুখে আনে গুজাবুড়ি তবে কচুবাটা পুরে দেবে ওর মুখে। অথবা ঠুঁসিয়ে ওর সেই গুজা কোমরের মতোই বেঁকিয়ে দেবে ওর থুতনিটা। মনে মনে এটাও স্থির করে রাখল নবিতুন।

এক কথার কত কথা মনে পড়ে যায় নবিতুনের।

বাপজান তখন জিন্দা। বাপজান আর নবিতুন, দু'জনের সংসার ওদের। নবিতুন এসেছে বাড়ীর পেছনে ডাঙ্গার ঢেঁকি শাখ খুঁজতে। আনমনে শাখ তুলতে তুলুত ও এসে পড়েছিল ওদের বাড়ীর সীমানা কান্দির পার অবধি। আচানক শুকনো পাতার মচ মচ শব্দ শুনে চমকে তাকায় নবিতুন। চমকে তাকিয়ে হিম হয়ে যায় নবিতুন। ডাঙ্গায় অচল গাছগুলোর মতোই থর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। না যেতে পাড়ে সুমুখে, না ছুটতে পারে পেছনে। কাছেই দাঁড়িয়ে রয়েছে মজল সারেংয়ের ব্যাটা। কিছুদিন ধরেই ও ঘুর ঘুর করছে নবিতুনের বাড়ীর আশেপাশটায়।

মজল সারেংয়ের ব্যাটা, সে নয় মস্ত জোয়ান, কিন্তু তার কাছাকাছি। কদম তার মাঝারি। হাত আর বাজুগুলো যেমন মোটা, তেমনি চ্যাপ্টা, তেমনি শক্ত। দেখে মনে হয় কালো রং করা এক জোড়া শালতি কাঠের থাম। গায়ে তার গেঞ্জি, পরনে হলদে সবুজ খোপ-আঁকা তবন। মাথায় টেরি। এক পলকে বুঝি অত্তটুকু দেখে নিয়েছিল নবিতুন। তারপর ঘরের দিকে মুখ ফিরিয়ে পা বাড়িয়েছিল। মজল সারেংয়ের ব্যাটা দুঃসাহসের তার অন্ত নেই। ঝট করে দু'কদম এগিয়ে আসে ও। আগলে দাঁড়াল নবিতুনের পথটা। পদ গায় ঃ

হিরামতি হিরামতি
আমি যামু সুধারাম কন্যামতি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিরামতি হিরামতি
তোমার লাইগা আনমু কি,
পুঁতির মালা পইরবে কি ?
পুঁতির মালা কালা সুতায় লাল
পুঁতির মালা ধলা সুতায় নীল ?
পুঁতির মালা গলার চিক
পুঁতির মালা গুলবদনি ঝিলিক।
হিরামতি হিরামতি
বড় গাঙ্গে নাও ভাসিয়ে
গহিন জলে ডুবাল দিয়ে
আমি যামু সুধারাম কন্যামতি।

কী বেহায়া রকমের রসিক মজম সারেংয়ের ব্যাটা। দেখনা 'গীত' গায় আর কেমন রসিয়ে রসিয়ে হাসে। ওর কি চোখের লাজ, মুখের শরম, কোন কিছুই নেই ? নবিতুন যে পালিয়ে বাঁচতে চায়। নবিতুন চোখ তুলতে পারে না, পা তুলতে পারে না। ওই বেহায়া হাসি আর বেলাজ দৃষ্টির সামনে। শুধু বেলাজ নয়, বেহায়া মজল সারেংয়ের ব্যাটা। ওটা একটা ডাকু। ডাকুর মতোই শালতি শালতি হাত দুখানি দুদিকে মেলে রুখে দাঁড়িয়েছে নবিতুনের পথটা।

কি চাও ? ওর দিকে না তাকিয়েই শুধাল নবিতুন।

চাই সাঙা করতে। বুঝি এক মুহূর্তও দেরী হল না উত্তরটা আসতে।

মাগো মজল সারেংয়ের ব্যাটা কেমন ত্যাঁদড় গো। মুখে কি ওর একটুও পর্দা নেই ? শরমে যে লাল হয়ে যায় নবিতুন। গা যে ওর কাঁপে। পা যে ওর ভেঙ্গে পড়ে। নবিতুন বলে—ছিঃ। ছিঃ বলে পা বাড়ায় নবিতুন। বেলাজ বেশরম আর ত্যাঁদড় হলেও মজল সারেংয়ের ব্যাটাটা বড় ভাল, বড় 'ভাস্যের' মানুষ। আস্তে সরে যায় একপাশে। পথ করে দেয় নবিতুনকে। কিন্তু পেছন থেকে শুধায়, ছিঃ মানে কি রে ?

নবিতুন কি আর জবাব দেবার জন্য ফিরে দাঁড়ায় ? পড়িমরি ঘরে পেঁছে আছাড় খেয়ে পড়ে চাটায়ের ওপর। থর থর করে কাঁপছে ওর শরীরটা। টিপ টিপ করছে বুকটা। আর কত যে খুশী। খুশীটাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেন ভয় আর কাঁপুনি হয়ে ওর সারা অঙ্গে দলে মথে ছড়িয়ে পড়ছে। খুশীর ভারে কাঁপতে কাঁপতেই নবিতুন ভাবে, ছিঃ মানে কি ? ছিঃ মানে তোমার মাথা। মুখে মুখে তো এন্তার ছড়া কেটে যেতে পার, আর ছিঃ মানে বোঝ না ?

কিন্তু, মজল সারেংয়ের ব্যাটা কি আর বুঝতে ভুল করে ? পরদিনই নবিতুনদের বাড়ী এসে হাজির ও। এ কথা সে কথা কত কথা জুড়ে দেয় নবিতুনের বাপজানের সাথে।

বেড়ার ওপারে শরমে মরে নবিতুন। মিঞা যতই কিস্‌সা জুড়ুক বাপজানের সাথে, নবিতুন কি আর বোঝে না কেন এসেছেন মিঞা ? বেড়াটার সাথে সেঁটে গিয়ে নিষ্কম্প বসে থাকে নবিতুন। চোখ দুটোকে ছোট্ট আর সুঁচলো করে ধরে বেড়ার ফুটোয়। ফুটো দিয়ে দেখে কালো রং শালতি কাঠের খামের মতো শক্ত বলবান দুটো বাহু, সাদা গেঞ্জি আর সেই হলদে-সবুজ খোপ আঁকা ভবন। আজ বুঝি সুরতে আরো চটক লাগিয়েছে মিঞা। টেরি তার বড় চকচকে আজ। গলায় লাল ডুমা, জড়িয়ে ঘুরিয়ে পিঠ প্যাঁচিয়ে গলার সাথে সুন্দর করে বেঁধেছে ডুমাখানা। লাল ডুমায় বেশ মানিয়েছে ওকে। বেশ মানিয়েছে ওকে, কথাটা মনে মনে একটু নাড়তে গিয়েই কেমন থরথরিয়ে কেঁপে যায় ওর গাটা। ওর শাড়ীটা খসখসিয়ে যায় বেড়ার গায়। ঠিক সেই সময় কী কান্ডটাই না করে বসল মজল সারেংয়ের ব্যাটা। মা গো মা, মনে করতে গেলে আজও বুঝি শরমে লাল হয়ে যায় নবিতুন। মজল সারেংয়ের ব্যাটা যেন কান খাড়া করে শুনল শাড়ীর ওই খসখসানি, বুঝি বা বেড়ার গায়ে অতর্কিতে নবিতুনের হাত লেগে খচ করে যে একটু শব্দ হল, সেই শব্দটাও। চকিতে উঠে এল মজল সারেংয়ের ব্যাটা, দরজা দিয়ে প্রায় অর্ধেকখানি শরীর গলিয়ে দিল বেড়ার ওধারে। নবিতুনের কোলের উপর দুটো পুঁতির মালা ছুড়ে দিয়ে বলল, গেছিলাম শহরে। তোর জন্য দুটো মালা আনলাম।

মরণ আর কি নবিতুনের। দিশেমিশে পায় না ও। না পারে ওভাবে বসে থাকতে, না পারে উঠে একটা ছুট দিতে। বেড়ার সাথে আরো সেটে এল নবিতুন, যেন চোখ বুঝে মিলিয়ে গেল। মিলিয়ে গিয়ে থর থরিয়ে বলল নবিতুন, ছিঃ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রসের অন্ত নেই মজল সারেংয়ের ব্যাটার। রস করেই শুধায়, ছিঃ মানে কি ? আঃ মরণ। আবার ছিঃ মানে…

নবিতুনের বাপজান তখন ডাকছে ওপাশ থেকে, আয়নারে নবিতুন। মজল ভাই আমার জ্ঞাতি ভাই নয়, কিন্তু তার চেয়ে বেশি—জানিভাই। তার ব্যাটার সামনে আবার পর্দা কি রে ? আয় এদিকে।

ইস, দেখ না কেমন পটিয়ে নিয়েছে বাপজানকে। বেড়ার গায়ে ধুপ করে একটা প্রতিবাদ রেখে দেয় নবিতুন।

কিন্তু পুতির মালা জোড়া হাতে নিয়ে যেন গলে যেতে চায় নাবিতুনের সারা অঙ্গ। পদ গাইতে গাইতে যেমনটি বলেছিল মজল সারেংয়ের ব্যাটা, কালো সুতায় লাল, ধলা সুতায় নীল, ঠিক তেমনি রং মিলিয়ে এনেছে পুঁতির মালা।

তাড়াতাড়ি মালা জোড়া তোরংয়ে তুলে যেন রক্ষা পায় নবিতুন।

মজল সারেংয়ের ব্যাটাটা ডাকু। মজল সারেংয়ের ব্যাটাটা রসিক। রসের তার শেষ নেই। চোখে তার হয়া নেই। মুখে নেই লাগাম। কিন্তু মজল সারেংয়ের ব্যাটা কামের ব্যাটা বটে। যেই কথা সেই কাম তার। কদিনের মধ্যেই, শাবানের চাঁদটা ঢেরে হতে না হতেই, নবিতুনকে বৌ করে ঘরে নিয়ে এল সারেংয়ের ব্যাটা কদম সারেং।

ঘরে এনেই শুধায় কদম সারেং, হারে নবিতুন, ছিঃ মানে কি ?

নবিতুনের মুখে তখন বোল ফুটেছে, মরসুমের হাওয়া পেলে যেমন বোল ফোটে আমের শাখায়। নবিতুন বলে, কেমন রসিক নাগর গো তুমি, ছিঃ মানে বোঝ না ?

বল না, ছিঃ মানে কি ? মুখটাকে একেবারে নবিতুনের কানের কাছে এনে আবারও শুধায় কদম।

ছিঃ মানে জী। জী মানে হাঁ। অবুঝটাকে এবার পষ্ট করেই মানেটা বুঝিয়ে দিল নবিতুন।

ছিঃ মানে এই। শালতি শালতি থামের মতো বলবান দুটো বাহুতে ওকে লুফে নিয়ে অর্থটা সেদিন বুঝিয়ে দিয়েছিল কদম।

সে-ই তো নবিতুনের কদম।

বিদেশের মধুতে ডুবে যাবে কদম, ভুলে যাবে নবিতুনকে, কেউ কসম খেয়ে বললেও বিশ্বাস করবে না নবিতুন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২

কিন্তু, নবিতুনের এবার চলবে কেমন করে ?

তিন তিনটে ধানভানা আর ডাল ভাঙ্গার কল বসেছে বাজারে। চৌধুরীরা, মুন্সীরা, পালরা, সবাই ধান ভানছে কলে। আজ একমাস ধরে বাড়ী বাড়ী ঘুরছে নবিতুন। 'বারা বান্দনী'র প্রয়োজন নেই কোন বাড়ীতে।

গত দুটো বছর এ সব বাড়ীর ধান ভেনেই দিন গুজারান হয়েছে নবিতুনের। কিন্তু এখন ? চোখে অন্ধকার দেখে নবিতুন।

তিনমাস ছয়মাস বাদ টাকা আসত সারেংয়ের। মায়ে ঝিয়ে এক রকম ফেলে ছড়িয়েই দিন কাটত ওদের। যাবার সময় থোক টাকা দিয়ে গিয়েছিল কদম। বলেছিল, গিয়েই যে জাহাজ পাচ্ছে তার কোন ভরসা নেই। আগের মতো গেলেই লুফে নিত তেমন অবস্থা নেই আজকাল। হিন্দুস্তানের অনেক লোক নেমেছে জাহাজের কাজে। তাই এ টাকা দিয়ে ছটা মাস কাটিয়ে দিবি। ছ'মাসের ভেতর টাকা পাবিই।

ছ'মাসটাও পেরিয়ে গেল। তবু মাথা ঘামায় নি নবিতুনের। ভেবেছে হয়তো কাম পেতে দেরী হচ্ছে কদমের। ছ'মাসের টাকা দিয়েই টেনে টুনে বছরটাকে চালিয়ে দিয়েছে নবিতুন। কিন্তু বছর ঘুরেও যখন টাকা এল না, চিঠি এল না, তখন সত্যি ভাবনায় পড়ে নবিতুন। এক সারেংয়ের ভাবনা। দোসরা নিজের এবং আক্কির খাওয়া লওয়ার ভাবনা। নানা ফিকির খুঁজে নিতে হয়েছে নবিতুনকে। মুরগী পালা, হাঁস পালা, চাটাই বোনা, কোরা বানানো, ডুলা বানানো, আর মণকরা চুক্তি করে 'বারা বান্দা'। এর মাঝে শেষের কাজটাই ছিল নবিতুনের বড় নির্ভর। সারা বছরই থাকত কাজটা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্যগুলো মাঝে মাঝের ফরমাইসি কাম। কেউ বাঁশ আর বেত দিয়ে গেল, দাও একটা কোরা বানিয়ে। কেউ দিয়ে গেল বেত আর পাটি পাতা, দাও একটা চাটাই বানিয়ে। ধীরে সুস্থে অবসর মতো করে দিত নবিতুন। তাতে আর ক পয়সা রোজগার।

পাল বাড়ীতে আর একবার ধর্ণা দিল নবিতুন। বলল, কলের মতন সাফ করেই চাল কাঁড়ব গো। মেহেন্নতের জন্য যা দিতে সেটা না হয় কমিয়ে দাও। তবু মণখানিক ধান দাও, আমি আস্তে আস্তে ভানি।

পাল বৌর বোধ হয় দয়ার শরীর! বলে: এখন তো মটকা ভর্তি চাল, এখন চাল করে রাখবই বা কই। তা তুমি যখন এত করে বলছ, এস সামনের মাসে। তখন দেখা যাবে।

তখন না হয় দেখবে পাল বৌ, কিন্তু এখন? এক সের চাল যে কোথাও ধার উধার মিলবে তারও উপায় নেই। বড় হিস্যার বড় গুমান। একদিন উধার দিবে তো তিন দিন খোটা দিবে। তবু শরবতি কতদিন আঁচলের আড়ালে লুকিয়ে লুকিয়ে একখোরা খুদ, আধখোরা চাল দিয়ে গেছে। এখনো দিয়ে যায়। বড় খারাপ লাগে নবিতুনের। তিরস্কার করেছে শরবতিকে, কেন চুরি করিস আমার জন্য?

তুমি যে আমার বুয়া। হাসতে হাসতে বলেছে শরবতি।

নবিতুন হাসতে পারেনি। কি এক অন্যায়বোধ খচ খচ করে বিঁধেছে ওর বুকটায়।

পালদের বাড়ী থেকে ফিরতে চৌধুরীদের পাড় ভাংগা পুকুর। নবিতুন দেখল বেশুমার ফুল ফুটিয়ে শাপলায় ভরে রয়েছে পুকুরটা। গোল গোল আর সাদা সাদা ফুলে ঢাকা পড়েছে পুকুরের কালো পানি।

শাড়ী বাঁচিয়ে যতটুকু নামা যায় ততটুকু পানিতে নামল নবিতুন। টেনে টেনে তুলল শাপলা। দু'হাতের দুটো মুঠি ভরিয়ে উঠে এল। একখানি কচি শাপলা কচর কচর করে চিবিয়ে পরম তৃপ্তিভরে খেল ও। সারাদিন দানাপানি কিছু পড়েনি পেটে।

সকালবেলা হাঁড়ি মালসা ঝেড়ে ঝুড়ে মুঠ দেড়েক তুষ ভরা খুদ খুঁজে পেয়েছিল নবিতুন। সেই খুদ দিয়ে জাউ রেঁধেছিল। জাউটা আকুকিই খেয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুমি একটু খাওনা মা। খেতে বসে বলেছিল এবং জিদ ধরেছিল আক্কি।

না, তুই খা। দুপুরে ভাত রাঁধব। তখন এক সাথে খাব আমরা।

কিন্তু, নয় বছরের মেয়েটি সবই যেন বোঝে। মায়ের মিথ্যাটাও বুঝি বুঝে নিয়েছিল ও। হয়ত তাই সারা দুপুর মায়ের কাছ ঘেষেনি। শরবতির বোনঝিটার সাথে খেলা করেছে। বেলা জোহরের দিকে এসে ঘুমিয়ে পড়েছে। পালবাড়ী রওনা হবার আগে ওর ঘুমন্ত মুখখানির দিকে একবার তাকিয়েছিল নবিতুন। কেমন শুকিয়ে গেছে মুখখানি। আধ পেটা খেয়ে খেয়ে বড় কাহিল ওর শরীর। নবিতুনের মনে হয়েছিল এই এক বেলাতে যেন আরো কাহিল হয়েছে আক্কি। আহা তা হবে না, কোনদিন তো আর একেবারে না খেয়ে থাকেনি মেয়েটি।

নবিতুন নিজেই বা কোন্ দিন না খেয়েছিল। বাপের ঘরেও না, খসমের সংসারেও না। কিন্তু এ কটা বছরের একটানা মসিবতে আগের সেই পেট ভরে ভাত খাওয়ার দিনগুলোকেই যেন সত্য বলে মনে হয় না নবিতুনের। বাড়ীতে পা রেখেই নবিতুনের সারা গায়ে যেন কাঁটা ফুটে গেল। বড় হিস্যার দাওয়ার বসে হুঁকো টানছে লুন্দর শেখ। পড়বি-তো পড় একেবারে তার সামনেই পড়ে গেল নবিতুন।

এক নজরে ওর দিকে চেয়ে থাকে লুন্দর শেখ। নজর তো নয় যেন একজোড়া লালাঝরা জিহ্বা। সে জিহ্বা দিয়ে নবিতুনের সারা গাটা যেন চেটে গেল লুন্দর শেখ। ত্রস্তে উঠোনটা পেরিয়ে ঘরে এসে খিল দিল নবিতুন। এখনো ঘুমোচ্ছে আক্কি। আক্কিকে বুকে টেনে জড়সড় হয়ে শুয়ে রইল যতক্ষণ না লুন্দর শেখ বড় হিস্যার দাওয়া ছেড়ে চলে গেল।

তারপর চুলো ধরিয়ে একটু নুণ মেখে শাপলাগুলো সেদ্ধ করে নিল নবিতুন। কোরবানের বৌর কাছ থেকে চেয়ে আনল দুটো শুকনো মরিচ। মরিচ দুটো গুঁড়া করল। গুঁড়োগুলো মেখে নিল শাপলার সাথে। মায়ে ঝিয়ে ভাগ করে খেল।

সন্ধ্যা হয়ে এল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নবিতুনের হাঁস মুরগীর পালটাও দিনে দিনে ছোট হয়ে এসেছে। এখন শুধু এক জোড়া হাঁস আর এক জোড়া মুরগী। এগুলো এখনো বিক্রী করেনি নবিতুন। উপোস দিয়েও ওদের ধরে রেখেছে।

দরজা বন্ধ দেখে দাওয়ায় উঠে এতক্ষণ ডাকাডাকি করছিল হাঁস-গুলো। ওদের ঠিক জায়গাটিতে রেখে দরজাটা ভেতর থেকে ভাল ভাবে এঁটে দেয় নবিতুন। তারপর এসে বসে আধো অন্ধকার দাওয়ায়।

ও নবিতুন, কই তুই ?

গুজাবুড়ির গলাটা যেন এই ভর সন্ধ্যায় অলক্ষ্যী প্যাঁচার ডাক। শিউরে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে নবিতুনের গায়ের লোম।

এই 'আন্ধারে' বসে আছিস ? ও, 'কেরাসি' নাই বুঝি ? যেন বড় দরদ মাখা স্বর গুজাবুড়ির।

তা 'কেরাসি' নেই বলতে হয়। গলার স্বরে আবারও অন্তরঙ্গতা ছড়ায় গুজাবুড়ি। তারপর লাঠিটা পাশে শুইয়ে রেখে বসে পড়ে নবিতুনের গা ঘেষে।

কিনা মনে মনে ঠিক করছিল নবিতুন ? কচুবাটা পুরে দেবে গুজাবুড়ির গায়ে, ঠুঁসিয়ে উড়িয়ে দেবে তার থুতনিটা ? কীভাবে কী করা যায় তাই মনে মনে আর একবারটি ভেবে নেয় নবিতুন।

শুনলাম দুপুরে নাকি পাক চড়েনি তোর। শুনে অবধি পেরে-সান আর বেচাইন মনটা—আহারে বাছারা আমার, কত কষ্টই না হচ্ছে ওদের। অন্ধকারে দেখা গেল না কিন্তু স্বরের কম্পনে বুঝিয়ে দেয় গুজা-বুড়ি, নবিতুনের দুঃখে ছলছল ওর চোখ !

আহা তুই কি আমার পর ? না পর ওই সোনামাণিক আক্কি ? আহা তোর মা শরিফন—সগির মা বুয়া বলতে ছিল অজ্ঞান। আর কদম ? সে তো আমার সাক্ষাৎ তালতো বইনের পোলা। আক্ষেপ গুজা-বুড়ির, নবিতুন স্বীকার করে না ঘনিষ্ঠ এই আত্মীয়তার সম্পর্ক।

না, থুতনি ভাঙবে না, কচু বাটারও দরকার নেই। এখনি এই অন্ধ-কারে কুটনী বুড়ির গলাটা টিপে ধরলে কেমন হয় ? নবিতুন ভাবে।

নে, বাছা ধর। সের আড়াই চাল, যা ছিল ঘরে তাই নিয়ে এসেছি। সংগে দুটো আন্ডা, কয়েকটা মরিচ পেয়াজ, একটু 'মিডা'। আর এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বোতলটায় একটু 'বালা' তেল নে রাখ। জিনিসগুলো বুঝি নবিতুনের দিকে এগিয়ে দেয় গুজাবুড়ি। বলে আবার, নিজের দোষেই তো আজ এই অবস্থা তোর। কত করে বলি তোরে, তুই তো উল্টো পিঁড়ি ছুঁড়ে মারিস।

হঠাৎ যেন খেয়াল হল গুজাবুড়ির, নবিতুন শুনছে না তার কথা। জিনিসগুলোও ধরছে না হাত বাড়িয়ে। কি হল নবিতুনের ?

নবিতুন ভাবছে।

কুটনী বুড়ির ছিনালি মাথায় নতুন চাল।

নিকা সাদিতে যদি তোর এতই আপত্তি হবে দরজাটা না হয় মাঝে মাঝে খোলা রাখিস ? এ তো আর কেউ জানছেও না, কেউ দেখছেও না। তোরও মান থাকছে, ঘর থাকছে, খসম থাকছে। কি বলিস ?

কিছু বলে না নবিতুন। নবিতুন ভাবছে।

যেন অন্ধকারে নবিতুনের মুখের কথা ঠাওর করার জন্যে সামনের দিকে একটু ঝুঁকে এল গুজাবুড়ি। ঝুঁকে এসে ফিসফিসিয়ে বলল ঃ আজ রাত ঠিক দুঘড়ি বাদ, দরজাটা খোলা রাখিস। লুন্দর শেখ... কথাটা শেষ করতে পারে না গুজাবুড়ি। আচমকা এক ধাক্কায় কোঁত্ করে কঁকিয়ে উঠেছে গুজাবুড়ি। শরীরটা তার নবিতুনের উঁচু দাওয়া থেকে গড়িয়ে পড়েছে উঠোনে। ওরে মেরে ফেললরে। তোরা আয়। মেরে ফেলল। মেরে ফেলল। চীৎকার করে ওঠে গুজাবুড়ি।

কি, হল কি ? বুড়ির চীৎকারে ছুটে আসে সবাই। কোরবান আর কোরবানের বৌ। শরবতির বাবা, ভাই, শরবতি—সবাই। কি হল ? কি হল ?

কি আবার হবে, দেখ না ? দূরে যেখানে ডুমুর গাছের তলায় থম-থমিয়ে রয়েছে ঘন অন্ধকার সেদিকে আঙুল দেখায় গুজাবুড়ি !

তা তোমাকে মারল কে ? শুধায় কোরবান।

হাত পা ঝেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে গুজাবুড়ি। লাঠিটা তুলে নিয়েছে হাতে। হঠাৎ কোরবানের দিকে খেঁকিয়ে উঠল গুজাবুড়ি, মারল আবার কে ? পালোয়ানিটা একবার ওদিকে গিয়ে দেখাও না। তবে না বুঝি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেমন পালোয়ান তুমি ? আবার ওই ডুমুর তলায় ঘন অন্ধকারের দিকে আঙ্গুল দেখায় গুজাবুড়ি।

তা ওখানে কি ? শরবতির বাপ পাতের ভাত ফেলে ছুটে এসেছে। তাই গালটা তার চড়া।

ওখানে বাগডাঁশ গো, বাগডাঁশ। বলছি কি এতক্ষণ ? এই এখান দিয়ে, মাগো, আমাকে এক ঢুস মেরে চলে গেল বাগডাঁশটা, ওই ওদিকে। ভাগ্যিস সঙ্গে সঙ্গে মেরেছিলাম...মাগো...।

ইতিমধ্যে কে যেন একটা লণ্ঠন নিয়ে এসেছে। লণ্ঠনটা নিয়ে ওরা ছুটে গেল ডুমুরতলার দিকে বাগডাঁশার খোঁজে। লাঠিটা সামনের দিকে ঠুকে ঠুকে পথ ঠাওর করে গুজাবুড়ি। পথ ঠাওর করে ধীরে ধীরে পা ফেলে। সগির মা গুজাবুড়ি, অনেক অপবাদ তার। অনেক কলংকের দূতী অনেক কলংকিনীর দোসর গুজাবুড়ি। কুল কন্যার কুল ভেংগেছে, গৃহবধূর গৃহ ভেংগেছে, সতী নারীর সতীত্বের পণ্য সওদা করেছে গোপন হাটে...সবই স্বীকার করে গুজাবুড়ি। কিন্তু হাটে কখনও হাড়ি ভাংগেনি, কারও মান ভাংগেনি গুজাবুড়ি। ঘোর দুশমনও এমন অপবাদ দিতে পারে না গুজাবুড়িকে। শংকামুক্ত হয়ে মনে মনে হাসে গুজাবুড়ি। খুশি হয় সামান্য অসাবধানে কামটা ভন্ডুল হয়ে যাচ্ছিল আজ।

হঠাৎ হাতের লাঠিটা ছিটে পড়ে যায় গুজাবুড়ির। চালের পোট-লাটা যে ছুড়ে মেরেছে নবিতুন, ওটা এসে পড়েছে গুজাবুড়িরই লাঠির গায়ে। মরিচ, পেয়াজ, 'বালা' তেলের শিশি, হোগলাপাতায় বাঁধা গুড়, একে একে সবই উড়ে উড়ে আসে গুজাবুড়ির দিকে। কোনটা বা বুড়ির পিঠে এসে লাগে, কোনটা মাটিতে পড়ে ছিটিয়ে যায়। তেলের শিশিটা ভেংগে যায়। অন্ধকারে যতটা পারল হাতড়ে জিনিসগুলো খুঁজে নিল গুজাবুড়ি। চালগুলোর জন্যই সবচেয়ে বেশী আফসোস হল ওর। তবু যতটা পারল তুলে নিল। 'বালা' তেলটা শুষে নিয়েছে ধুলোয়। তবু উপর উপর হাত বুলিয়ে যা উঠে এল হাতে মুখে মাথায় মেখে নিল গুজাবুড়ি।

অনেক তেজীর তেজ নাবিয়েছে, অনেক দেমাকীর দেমাক কিনেছে গুজাবুড়ি। গুজাবুড়ি জানে কত সবুর করতে হয় এ সব কামে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সবুরে মেওয়া ফলে। ঠুক ঠুক লাঠির আগায় পথ খুঁজে খুঁজে চলে আর মনে মনে হাসে গুজাবুড়ি।

অন্ধকারে বুঝি ভেসে ওঠে কদমের মুখখানি।

যত ভাবনাই থাকুক, যত দুশ্চিন্তাই থাকুক নবিতুনের মনে, শুলেই সব ভাবনা দুশ্চিন্তা এক পাশে ঠেলে আসে কদমের মুখখানি। কদমের মুখ খিদের জ্বালাটাও ভুলিয়ে দেয় দিনমানের এতসব লাঞ্ছনা যন্ত্রণা। কি যে যাদু এ মুখে। তিন বছরেরও উপর নবিতুন দেখে না সে মুখ। তবু এই অন্ধকার রাতে কেমন স্পষ্ট হয়ে সামনে এসে দাঁড়ায় ওর কদম। সেই শালতি শালতি হাত, সেই হাসি ভরা মুখ।

আক্‌কিকে আরো কাছে টেনে নেয় নবিতুন। আক্‌কির মাথাটা তুলে নেয় বুকের উপর। বুকের উপর চেপে ধরে আক্‌কির মুখখানি। ঘুমের ঘোরে আক্‌কি বুঝি জড়িয়ে ধরে মায়ের গলাটা। মেয়েটা ঘুমোয়। মা জেগে থাকে। জেগে জেগে মনটা বুঝি ওর চলে যায় কোন দূর দূরান্তে। কোন দূরের সাগরে জাহাজ ভাসিয়েছে কদম, কে জানে। নবিতুন শুনছে সে সাগরে নাকি কুল নেই কিনারা নেই। আর সে জাহাজ তো জাহাজ নয়। ওই লুন্দর শেখের দোতালা দালানটার চেয়েও বড় দালান, যন্ত্রের কেরামতিতে অথৈ পানির উপর ভেসে চলে। আসমান উঁচু সব ঢেউয়ের উপর চড়ে চড়ে সাঁতার কাটে। ভাবতে গেলে তাজ্জব বনে যায় নবিতুন। সেই জাহাজের বোতাম টেপে, কল ঘোরায় সেই জাহাজের সারেং নবিতুনের কদম ? আহা, নবিতুন যদি একবারটি দেখতে পেত কদমকে, সেই আসমান উঁচু ঢেউয়ের মাথায় আজব জাহাজের কাণ্ডারী কদমকে ! কত দিন সাধ জেগেছে ওর। কিন্তু ভেবে ভেবেও কিছুতেই বেড় পায় না, দিশে পায় না নবিতুন। আন্দাজ পায় না নবিতুন। কুল নেই কিনারা নেই থৈথৈ পানি, তার মাঝে বিরাট দালানবাড়ীর মতো জাহাজ, হেলে দুলে বাঁশি বাজিয়ে চলেছে। সে যে কী, সে যে কেমন, মনের বাহু মেলে বেড় পায় না নবিতুন।

কেমন করেই বা বেড় পাবে ও ? বাপজান ওকে কোলে চড়িয়ে আদর করত, সেই তখন কয়ালের উপর দিয়ে নৌকা চড়ে মামা বাড়ী নাইয়োর গেছিল নবিতুন। বাবারে, সে কি নদী, এ কুল ও কুল কিছুই চোখে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পড়ে না! শুধু পানি আর পানি। নবিতুনের তো মাথা গেছিল ঘুরে। লোকে বলে ঃ

যে দেয় কয়াল পাড়ি
বৌ তার দুপুরের রাঁড়ি।

কিন্তু, এই কয়াল সেও নাকি সমুদ্রের কাছে কিছু না। সমুদ্রের পাশে কয়াল। বড় জোর বদনার সরু নলের এক সুতো পানি অথবা সারেংবাড়ীর পেছনের চিকন নালাটি।

আচমকা টিপ করে ওঠে নবিতুনের বুকটা। বেঁচে আছে তো সারেং? নবিতুন শুনেছে মানুষের চেয়ে উঁচু উঁচু সেই সব ঢেউয়ের বাড়ি খেয়ে, পানির তলায় লুকিয়ে থাকা পাহাড়ের আঘাতে জাহাজ নাকি ভেংগে যায়। কিনার তো নেই যে সাঁতায় কেটে ডাংগায় উঠবে?

না, এই চিন্তাটাকে আমল দেবে না নবিতুন। ঘুমোলে আসলেই অন্য সব ভাবনার সাত্রে এই অলুক্ষুনে চিন্তাটাও যেন কোত্থেকে ধেয়ে আসে।

কানটা খাড়া করল নবিতুন। কে যেন বেড়ার গায়ে নখ বুলোচ্ছে, আঁচড় কাটছে। বিড়াল কি?

না, বিড়াল নয়। ধপ ধপ দুটো থাপ্পড়ও পড়ল বেড়ার গায়ে। তারপর 'কুই' পড়ল একটা, দুটো। পর পর আরও কয়েকটা।

দুঘড়ি বাদ দরজাটা খোলা রাখতে বলেছিল গুজাবুড়ি। বেজন্মা লুন্দর শেখ নয়তো?

সজাগ হল নবিতুন। উঠে বসল। হাত বাড়িয়ে শিথানের কাছে রাখা ছেনিটা তুলে নিল। চেঁচিয়ে বলল ঃ কোন হারামজাদা কমজাত রে? বুঝি নবিতুনের গলা পেয়ে বন্ধ হল 'কুই'টা। বেড়ার গায়ে আঁচড়টাও। এবার-নিঃসন্দেহ নবিতুন, এ নিশ্চয় কোরবানের কাজ। ইদানীং আসতে যেতে কোরবান নজর ফেলছে ওর দিকে। এর আগেও কয়েকবার আঁধার রাতে 'কুই' দিয়েছে।

আবার 'কুই' পড়ল। এবার খুব আস্তে এবং দরজার দিকে। কয়েকটা টোকা পড়ল দরজার গায়ে।

খবরদার, ছেনি মারব বলে দিচ্ছি। উঁচু গলায় সাবধান করে দিল নবিতুন। সাবধানী পেয়েও থামে না টিনের দরজার গায় ঠন ঠন শব্দটা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেমন বেলাজ বেহায়ারে। ঘরের বৌ খুয়ে এ সব বেশরম কান্ড। দাঁড়া তোর কানটা যদি কেটে না রাখি তবে আমার নাম নবিতুন নয়। ঝট করে চৌকি ছেড়ে নেমে আসে নবিতুন। ঝনাৎ করে খুলে ফেলল টিনের দরজাটা।

অন্ধকারেই যেন দেখল নবিতুন, অন্ধকারের চেয়েও কালো একটা মানুষ শক্ত মাটিতে ধপ ধপ শব্দ তুলে দৌড়ে চলে গেল পুব হিস্যার দিকে। কী দুঃসাহস নবিতুনের। এই ঘুরঘট্টি আঁধারে খুলে ফেলল দরজাটা! লোকটা না পালিয়ে যদি ঝাঁপিয়ে পড়ত ওর উপর? কী করতে পারত নবিতুন? ঝটাপট দরজাটা বন্ধ করে চৌকিতে ফিরে আসে নবিতুন। গরগরিয়ে কাঁপছে ওর গাটা।

কিন্তু এমন করে নিজেকে কত রাত রক্ষা করে চলবে নবিতুন। এত উৎপাত, এত যন্ত্রণা, এত অভাব, প্রলোভন। কতদিক কতদিন সামলাবে নবিতুন?

ভেসে যায় নবিতুনের বুকটা।

রাতের আঁধারের মৌণ সমর্থন পেয়ে গমকে গমকে বেরিয়ে আসে কান্না আর নিঃশব্দ একটি জিজ্ঞাসা—আরেং কি আর আসবে না?

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩

নবিতুন, নবিতুন, তুই কই ?

এ কি, কাকে খুঁজছে কদম ?

ঘুমটা ভেংগে যায় কদমের। বুঝি স্বপ্ন দেখেছিল। চোখ কচলে উঠে বসল কদম।

আশেপাশে কাউকে স্পষ্ট করে চেনা যায় না। শুধু দেখা যায় লম্বা হয়ে ঘুমোচ্ছে হাফ জাইংগা পরা লোকগুলো। মাথার উপর বার হাত উঁচু সিলিংয়ের লাগ টিমটিমে বিজলী বাতিটা নিভে গেছে কখন। টাট-পট্টী আর কম্বলের ফাঁক থেকে একটা বিড়ি বের করল কদম। বিড়িটা নিয়ে এগিয়ে এল দরজার দিকে। সিপাহি বাবুকে ডাকল। সিপাহি বাবুর হ্যারিকেন থেকে ধরিয়ে নিল বিড়িটা। লম্বা একটা টান দিয়ে ধোয়া ছাড়তে ছাড়তে ফিরে এলো বিছানায়।

তিন বছরে নবিতুনকে কখনো স্বপ্নে দেখেনি কদম। আজই প্রথম দেখল। দেখল স্বপ্নে এবং স্বপ্নের মাঝেই আবার হারিয়ে ফেলল। ঘুমের ঘোরেই তাই খুঁজেছে ওকে, চেঁচিয়ে উঠেছে। ভাগ্যিস কেউ জেগে ওঠেনি। বামনছড়িতেও বুঝি এখন রাত ! হয়ত অঘোরে ঘুমোচ্ছে নবিতুন। হয়ত বা এমনি স্বপ্ন দেখে চেঁচিয়ে উঠেছে বুকের। ধন চোখের মণি আক্কি, সেও হয়ত জেগে উঠেছে মায়ের চীৎকার শুনে।

ফু উ-উ। আর একটা লম্বা টানে বিড়ির ধোয়া খেল কদম। তারপর চটের জায়নামাজ দিয়ে প্যাঁচিয়ে বাঁধা পোটলাটা খুলল আস্তে আস্তে। তুলে নিল কোর্তাটা। কোর্তার 'চোর' পকেট থেকে অতি যত্নে বের করে আনল নবিতুনের চিঠিখানা।

দু'বছর আগের লেখা চিঠি। হাতের ঘষার আর বারবার খুলে পড়ার দরুণ ভাঁজে ভাঁজে ছিঁড়ে চার পাঁচ টুকরো হয়েছে চিঠিটা।

এখন অধিকাংশ অক্ষর তার অস্পষ্ট। তবু রোজই অন্ততঃ একবার চিঠিখানা খুলবে কদম। পড়ুক বা না পড়ুক একবার চোখ বুলিয়ে নেবে মুখস্থ হয়ে যাওয়া অক্ষরগুলোর উপর। তারপর ছিন্ন টুকরোগুলো আবার ভাঁজে ভাঁজে মিলিয়ে পরিত্যক্ত সিগারেটের অয়েল পেপারে মুড়ে রেখে দেবে কোর্তার সেই 'চোর' পকেটে। দিনভর কোর্তার সাথে সাথে চিঠিটাও যেন জড়িয়ে থাকে ওর গা। রাতে সেই কোর্তাটাকেই তা করে মাথার নীচে বালিশ হিসাবে ব্যবহার করে কদম।

আলো নেই। বাইরের উঁচু ফ্লাশ লাইটের কয়েক ছোপ আলো জানালা দিয়ে গড়িয়ে পড়েছে। সেই আলোতে জীর্ণপত্রের ছিন্ন টুকরো-গুলো একবার দেখে নিল কদম। আবার ভাঁজ করে রেখে দিল। খালাসের দিনটা যত ঘনিয়ে আসছে নবিতুনের কথাটা যেন ততই মনে পড়েছে কদমের। আর ওই চিঠি পড়ার মাত্রাটাও বুঝি বেড়ে গেছে। কেমন করে কী হয়ে গেল। আর তিন বছর পরেও সবটা থিতিয়ে চিন্তা করতে পারে না কদম। চিন্তা করতে গেলেই কেমন তালগোল পাকিয়ে যায় তার।

দুনিয়ার নানা বন্দরের মাল নিয়ে খিদিরপুরে এসে নোংগর ফেলেছে র‍্যাভেনপোর্ট জাহাজ। দেশী সারেং খালাসিদের মুখে নামটা হয়েছে র‍্যাভেনপোর্ট বা রাবনপোত।

কদমের পরিচিত জাহাজ। বার দুই এই জাহাজেই দুনিয়াটা চক্কর দিয়ে এসেছে ও, এবারও এই জাহাজেই বহাল হবার ইচ্ছে ওর।

বিকেল নাগাদ বোধ হয় জাহাজটা ভিড়বে জেটিতে। সকালেই স্থানীয় লঞ্চের সুকানী হারেস এসে বলল, চল জব্বর ভাইকে দেখে আসি। জব্বর র‍্যাভেনপোর্টের সারেং, কদমের মুরুব্বী পর্যায়ের লোক।

ইতিমধ্যেই মাল আনা-নেয়ার একটা নৌকা টেনে এনে অনেকেই চড়ে বসেছে। ওরা রাবনপোতের পুরনো দোস্ত ইয়ারদের সাথে আগে ভাগেই সালামত মোলাকাতের পর্বটা সেরে আসতে চায়। হারেসের সাথে কদমও চড়ে বসল নৌকায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাঝ দরিয়ার রাবনপোতের সংগে নৌকাটা ভিড়িয়ে দোয়া সালাম কুশলাদি আদান প্রদানের পর অনেক ঠাট্টা মশকারার বান ছোটাল ওরা। পার থেকে ওরা নিয়ে গেছিল খিলি পান, জর্দা কিমাম। সে পান ছুড়ে দিল জাহাজে। জাহাজ থেকে জব্বর সারেং উপুর হয়ে ছোট্ট একটা চামড়ার প্যাকেট তুলে দিল কদমের হাতে। বলল—রেখে দাও, পারে গিয়ে নেব।

পার থেকে বুঝি সবই লক্ষ্য করছিল শুল্ক ইন্‌স্পেক্টরের আরদালি হরকিষণ। নৌকাটা কুলে ভিড়তেরই এল হরকিষণ। চেপে ধরল কদমের জামার কলারটা। কদমকে টেনে নিয়ে গেল এক পাশে।

কদম অপ্রস্তুত।

হরকিষণ চায় কদমের কব্‌জিতে বাঁধা ঘড়িটা।

যদি রশিকতাই হয় কদম বুঝতে পারে না হরকিষণের এই বিচিত্র রসিকতা। গেল খেপের আগের খেপে এই রাবনপোত জাহাজেই চুক্তিতে ছিল কদম। সে বছরই হংকং থেকে ঘড়িটা কিনেছিল কদম। ঘড়ি যে তার খুব কাজে লাগে, তা নয়। সখ করেই কিনেছিল ও। সেই সখের জিনিসটার উপর হঠাৎ হরকিষণের নজর পড়ল কেন, বুঝতে পারে না কদম।

কিসের ঘড়ি? বলল কদম।

অ—বে, দিল্লিগী রাখ। ধমকে উঠে হরকিষণ। কদমের জামার কলারের উপর আরো শক্ত হয় মুঠোটা। দৃষ্টিটা কঠিন।

এবার শুধু অপ্রস্তুত নয়, রীতিমত ভ্যাব্যাচ্যাকা কদম। হরকিষণের দৃষ্টিতে যেন অন্য কিছু।

লে আধাআধি বখরা। পাকেট হাম নেহি দেখেগা, হাতমে জুহ্যায় দে দে।

এবার ধমকের গলাটাকে নীচু আর শান্ত করে বুঝি আপোষের প্রস্তাব দিল হরকিষণ। এই সুযোগে হরকিষণের মুঠো থেকে জামার কলারটা মুক্ত করে নিল কদম। ঠাট্টার সুরেই বলল, যা যা, এক হাতে বহিন দিবি আর এক হাতে ঘড়ি নিবি। ঘড়ি মুফতে আসে কিনা? বহিনের উল্লেখে মুহূর্তে তেলে-বেগুনে হল হরকিষণ। হাত বাড়িয়ে ধরতে গেল কদমের জামার কলারটা। চকিতে সরে গেল কদম।

এতক্ষণে যেন বুঝল কদম, রসিকতা নয় হরকিষণের। সত্যি সত্যি কদমের হাত ঘড়িটা চায় হরকিষণ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বহিনের উল্লেখে ক্ষিপ্ত হরকিষণ। হাতের সুমুখ থেকে কদমের গলাটা অমন করে ফসকে যাওয়ায় আরও ক্ষিপ্ত হল ও। মুহূর্তে পকেট থেকে পেন্সিল কাটা একখানি ছুরি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল কদমের উপর।

আত্মরক্ষার তাগিদে শিরাগুলোকে টান করে সজাগ হল কদম। বার দুই গোত্তা খেয়ে ব্যর্থ করে দিল হরকিষণের লক্ষ্যটা। দুজন দুজনকে ধরে ফেলল বাহুর বেষ্টনে। নবিতুনের কদম। বাহু যার শালটি কাঠের থাম। শক্ত বলবান সে বাহুর পেষণে শিথিল হল হরকিষণের হাতের মুঠো। খসে পড়ল সে পেন্সিল কাটা ছুরিটা।

ব্যাপার স্যাপার দেখে সটকে পড়েছে নৌকার লোকগুলো। অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে হারেস, কি করবে কিছুই যেন ঠিক করে উঠতে পারছে না। খসে পড়া সেই ছুরিটা তুলে নিল কদম। কোনদিক দৃক-পাত করার বুঝি সময় নেই। পর মুহূর্তেই ছুরি শুদ্ধ নেবে এল ওর উত্তোলিত বাহু। পিঠের দিকে হরকিষণের জামায় জেগে উঠল বড় এক ছোপ লাল।

তবু নাছোড়বান্দা হরকিষণ। জখমি হয়েও জড়িয়ে থাকল কদমের কোমরটা। পাছড়াপাছড়ি, ধস্তাধস্তি চলল সমানে।

কিন্তু কেঁচো খুঁড়তে যে সাপ বেরিয়ে পড়বে সেটা ওরা কেউ ভাবেনি। হরকিষণও না, কদমও না। ধস্তাধস্তির সময় কদমের কোমরের গোঁজ থেকে ছিটকে পড়ল জব্বরের আমানত সেই চামড়ামোড়া প্যাকেটটা।

ইতিমধ্যে পেঁছে গেছে পোর্ট পুলিশ। তুলে নিয়েছে সেই চামড়ায় মোড়ো প্যাকেটটা আর হরকিষণের কাঁধ থেকে সেই ছুরিটা।

যথারীতি আইনের বিধানে ফাটকে চালান গেল কদম। যথা সময়ে সম্পন্ন হল হাকিমের বিচার।

অপরাধ কদমের, আইনের চোখে ধুলো দিয়ে 'বিঝাড়া' মাল পাচারের চেষ্টা করেছে, কর্তব্যরত কর্মচারীকে কর্তব্য পালনে বাধা দিয়েছে আর তিন নম্বর, দায়িত্বরত হরকিষণ নামক কর্মচারীকে তীক্ষ্ন অস্ত্র দিয়ে জখমী করেছে।

সাজা হল কদমের। দু'বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং এক হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরো এক বছর কারাদণ্ড।

আইনবেত্তারা বলল গুরু পাপে লঘু দণ্ড দিয়েছেন মেহেরবান হাকিম। অমন যে ধারাল ছুরি নিয়ে কদম ঝাঁপিয়ে পড়েছিল হরকিষণের উপর, কে বলবে খুন করার ইচ্ছে ছিল না কদমের। কিন্তু দয়াল হাকিম সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন কদমকে। তাই, আইনবেত্তারা আরো বলল, আল্লার দরবারে শোকর গুজার করুক কদম আর দোয়া মাংগুক মেহেরবান হাকিমের জন্য।

আইনবেত্তাদের কথায় কী সান্ত্বনা পেল কদম ?

মনটা আজ উড়ু উড়ু কদমের। তিন বছরের সাজার মেয়াদ আজই শেষ। বাকী শুধু আজকের বিকেল আর রাতটা। আগামীকাল সকালেই খালাস পাবে ও।

কাজে মন বসছে না কদমের। দশ সের ডাল নিয়ে ভাংতে বসেছে সেই সকাল বেলায়। সকাল পেরিয়ে গেছে। 'সুস্তির' ঘন্টি পড়েছে। 'সুস্তি' শেষ হয়েছে। আবার কাজের 'তিনঘন্টি' পড়ে গেল। অথচ এক সের ডালও ভাংগা হয়নি কদমের।

পাথরের চাকতিগুলো যেন বড় ভারি আজ। কিছুতেই নড়তে চায় না। একবার কি দুবার ঘুরিয়ে এনেই অবশ হয়ে পড়ে কদমের হাত। হাত গুটিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে কদম। এদিক ওদিক ঢুঁ মারে মনটা।

সে কবে একখানি চিঠি পেয়েছে নবিতুনের, তারপর আর কোন চিঠি নেই ওর। কেন ? কদমের চিঠিগুলো পেল কিনা নবিতুন তাও তো জানতে পারল না কদম। অবশ্য মামলার পর ওকে চিঠি দেয়নি, কেননা আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের ছাপ মারা চিঠিটা যখন পেঁছুবে বামনছাড়ি, তৈরী হবে নানা ব্যাখ্যা, নানা অর্থ তার চেয়ে বেশী কদর্থ। সে সব কথা পেঁছিবে নবিতুনের কানে।

পড়তে না জানলেও কদমের চিঠিগুলো উল্টিয়ে দেখে নবিতুন। এই চিঠিখানাও তেমনি করে দেখবে ও। দেখবে ভেতরের বাইরের সেই বিচিত্র ছাপাগুলো। মানুষের কথায় বিশ্বাস না করে উপায় থাকবে না নবিতুনের। ছোট হবে, দমে যাবে ওর মনটা। কালো হবে ওর মুখটা। তাই চিঠি লেখার লোভটাকে সামলে গেছে কদম।

পাহারাটা ঘুর ঘুর করছে। 'মেট' আসছে। এবার ওদের বুঝিয়ে দিতে হবে সারা দিনের বাঁধা কামটা। তাড়াতাড়ি চাকতির উপর হাত রাখল কদম, পেশল শক্ত হাতের জোরে ঘুরে গেল চাকতি। শব্দ উঠল গর-র-গর-র সেই পরিচিত শব্দ। চাকতির ঘর্ষণে গোটা ডালগুলো ভেঙ্গে চুরে ছিটিয়ে পড়ল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু না, কী এক ক্লান্তিতে ভেঙ্গে আসছে কদমের শরীর। হাত জোড়া আর চলতে চায় না। এমন তো হয়নি কখনো ?

কারা মেয়াদটা তো ওর এই ডাইল চাক্কিতেই কাটাল। ডাইল চাক্কি সম্পর্কে কয়েদীদের ভয়। ডাইল চাক্কির কাম বড় ভারি কাম, পানি করে দেয় গায়ের রক্ত। কিন্তু কদমের কাছে খাটুনিটা খাটুনিই মনে হত না। নিজের হিশ্যাটা সেরে আরও দু পাঁচ জনের ডাল ভেঙ্গে দিত কদম।

কদমের হাতের টানে বো বো গর-র গর-র বিদ্যুতের মতো ঘুরত যাঁতা। চাকতিতে ঘর্ষণে যেন আগুন ছুটবে। শব্দটাই শুধু কানে আসত, চাকতি আর চোখে পড়ত না। মনে হোত গাদা মতো একটা তপ্ত ঘূর্ণী চারদিকের বাতাসটাকে ঘুটিয়ে পাকিয়ে প্রচন্ড বেগে ঘুরে চলেছে। আর দেখা যেত মাথার চুল থেকে পা পর্যন্ত কদমের শরীরটা ধুলো আর ডালের গুঁড়োয় শাদা হয়ে গেছে। সেই শাদা শরীরের উপর দিয়ে কালচে রকমের রেখায় দরদরিয়ে ঘাম ছুটছে। এক সাথে পুরো দশ সের ডাল ভেঙ্গে তবে থামত কদম। বাইরে এসে জিরিয়ে নিত। সেই কদমের হাত চলে না আজ।

পাশের যাঁতার সুধীর অনেকক্ষণ ধরে দেখছে কদমের কান্ডটা। নিজের কাজের হিসাবটা মেটকে বুঝিয়ে দিয়ে কদমের পাশে এসে দাঁড়ায় ও, বলে, হা বুইষ ছি, দ্যাশের লাইগা ক্যামন ক্যামন কইরতাছে। যাও, বাতাস খাইয়া আহ।

ঢাকার মানুষ সুধীর। পাকিস্তান হবার পর চলে এসেছে কলকাতায়। কিন্তু 'দ্যাশের' বুলিটা ছাড়তে পারেনি।

একটু হাসল কদম। চাকতির ডাঁটিটা সুধীরের হাতে সঁপে দিয়ে বেরিয়ে এল ও। এতদিন ওদের মদদ্ দিয়েছে কদম। আজ ওরাই করে দেবে কদমের কাজ। কিন্তু খালাসের দিনে গায়ে বল নেই, মনে ফুর্তি নেই কদমের, এ কেমন কথা ? অথচ এই দিনটির জন্য কত ব্যাকুল প্রতীক্ষা, আঙ্গুলে প্রতি ঘন্টা আর প্রতি দিনের হিসেব গোণা।

তিনটি বছর যেন গরম খোলার উপর জ্যান্ত মাছের মত ছটফটিয়ে মরেছে কদমের মনটা। মনে হয়েছে এই জিন্দানখানার দিন বুঝি শেষ হবে না কখনো। আসবে না মুক্তির দিন। অথচ এই মুক্তির দিনেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আনন্দ নেই, উৎসাহ নেই মনে! এই মুক্তির দিনটিতেই যেন দুনিয়ার যত আশংকা ভয় দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা এক সাথে কদমের মনটার উপর আছড়ে পড়েছে।

নবিতুন আর আক্‌কি, কেমন করে দিন কাটছে ওদের?

সেই যখন ফ্যাসাদে পড়েছিল কদম তখুনি বুদ্ধি করে কিছু টাকা হাওলাৎ করেছিল, নবিতুনের জন্য পাঠিয়ে দিয়েছিল। সেই টাকাটা যে পৌঁছেছে নবিতুনের হাতে তাতে কোন সন্দেহ নাই, কেননা সালেক সাহেব নিজে এসে সে খবরটা জানিয়ে গেছে ওকে। জাহাজীদের দরদী সালেক সাহেব। সালেক সাহেব কখনও বাজে কথা বলেন না।

কিন্তু সে টাকায় বড়জোর ছয় মাসের খোরাকী চলেছে নবিতুনের। তারপর? তারপর তো আর কোন টাকা পাঠাতে পারেনি কদম। কেমন করে চলেছে নবিতুনের, কে জানে। কদমের মনে হয় কে যেন কোঁচ চালিয়ে ঝাঁঝরা করে দিয়ে গেল ওর কলজেটা।

আগামী কাল যে বেরিয়ে যাচ্ছে কদম। বেরিয়েই বা কী করবে ও? নবিতুনকে, আক্‌কিকে না দেখেই জাহাজ ধরবে? একবার মনে হয় ওর, না বাড়ীই যাবে ও। কিন্তু সে ইচ্ছেটা এক পলের বেশি বুঝি ঠাঁই পায় না ওর মনে। খালি হাতে ও কেমন করে যাবে নবিতুনের সম্মুখে! বৌ মেয়ে ওদের জন্য কি নিয়ে যাবে কদম, খালি হাতে বাড়ী গিয়ে খাবেই বা কি! কোন মীমাংসাই খুঁজে পায় না কদম। দুশ্চিন্তাগুলো যে ডাল ভাংগার ওই মোটা চাকতির মতোই ভারি হয়ে বসে থাকে ওর বুকের ওপর। সুধীর এসে বসে কদমের পাশে। বলে, নাও, অহনে বুঝাইয়া দাও গিয়া তোমার 'মেটে'রে।

কৃতজ্ঞতায় কেমন ছলছলো হাসে কদম। সুধীরও হাসে। কয়েদী বন্ধুকে ফাটকের ওপারে মুক্তির জগতে বিদায় দিয়ে খুশি, আশা, বেদনা আর শূন্যতা মিশিয়ে যেমন করে হাসে অন্য কয়েদীরা।

ডাইল চাকতির অন্য কয়েদীরাও হাসল—পরদিন সকাল বেলায়—তেমনি খুশি, আশা, বেদনা আর শূন্যতায় এক বিচিত্র মিশ্রণ হাসি। তারপর গলায় গলা মিলিয়ে বিদায় দিল প্রায় বছরের সুখ-দুঃখের সাথী কদমকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪

শুধু পানি আর পানি। যে দিকে চোখ যায় সে দিকেই পানি। সারা জাহাজে যেন পানি ছাড়া অন্য কিছুরই অস্তিত্ব নেই। পানির উপর দিয়ে রুতুন্দা জাহাজটা হাঁসের ছোট্ট বাচ্চাটির মতো সাঁতার কেটে চলেছে। সাঁতার কেটে চলেছে মালবাহী জাহাজ রুতুন্দা। এ সাঁতারের যেন বিরাম নেই, ছেদ নেই। এ বন্দর থেকে সে বন্দর। সে বন্দর থেকে আর এক বন্দর। বিচিত্র বিপণী বুকে ধরে অবিশ্রান্ত তার ছুটাছুটি। ইঞ্জিন ঘরে অতন্দ্র নাবিক কদম, রুতুন্দার ছোট সারেং। রেলিংয়ে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে ও। চোখ তার স্থির নিবদ্ধ কম্পাসের কাঁটায়। কম্পাসের কাঁটাটা কাঁপছে। কম্পাসের কাঁটাটা হেলে গেল ডানে। কম্পাসের কাঁটার সাথে সাথে চোখের পাতাটা নড়ে কদমের। ভ্রূ জোড়া কুঁচকে গিয়ে স্থির হয় আবার।

ইঞ্জিন ঘরের গরমটা যেন রোঁয়ায় রোঁয়ায় সেদে গিয়ে সেদ্ধ করে চলেছে কদমের গোটা শরীরটা। খালি গা, দরদরিয়ে ঘাম ঝরছে। ভিজে গেছে মাথার চুল। কপালের দিকে ঝুঁকে পড়া চুলের আগা থেকে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম ঝরছে। লোনা ঘাম চোখে গিয়ে জ্বালা ধরিয়েছে চোখে। প্যান্টের পকেট থেকে রুমাল বের করে কপাল আর মুখের ঘাম মুছে নেয় কদম। ইঞ্জিনের গর্ত ছেড়ে উঠে আসে পাদানিতে।

এখানে ক্রনোমিটারে চোখ পড়ে বিরক্তিতে ভরে যায় কদমের মুখখানি। অকারণেই ধপাধপ কয়েকটা লাথি ছুড়ে মারে রেলিংয়ের গায়ে। কঠিন ইস্পাতে বাড়ি খেয়ে পা ওর ফিরে আসে, জুতোর ভেতর পায়ের পাতাটা বুঝি ব্যথায় টনটন করে ওঠে। পা ছেড়ে এবার হাতের জোর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লাগায় কদম। দু'হাতে চেপে ইস্পাতের রডটাকে প্রচণ্ড রাগে বাঁকিয়ে চলে। জড় কঠিন ইস্পাতের দেহ অনড়, অটল। এতটুকু কাঁপে না, বাঁকায় না। কদমের শক্তিটাই প্রতিঘাতে দ্বিগুণ হয়ে ফিরে আসে কদমের মাঝে। বিদ্যুতের মতো সঞ্চারিত হয় ওর সারা অঙ্গে। ঝাঁকুনী খায় সারা গা। বিড়বিড়িয়ে চলে কদম, শালার ইঞ্জিনিয়ার, শালার কাপ্তান। শালা। জুচ্চোর। ফাঁকিবাজ।

ডেকের দিকে দেখা যায় বড় সারেং মন্তু মিয়াকে। মন্তু সারেংকে দেখে কাপ্তানের বিরুদ্ধে আক্রোশটা যেন চতুর্গুণ বেড়ে যায় কদমের। অনুপস্থিত পূর্বপুরুষ এবং ভাবী পুরুষ কেউ বাদ যায় না ওর আক্রোশের অভিশাপ থেকে। কদমের রাগের কারণ অনেক।

এ সময়টা কদমের ডিউটি দেবার কথা নয়। তবু ডিউটি দেয়া হচ্ছে, কেন না এটা শাস্তি। কিছুই না, সেকেণ্ড ইঞ্জিনিয়ারের সাথে মামুলী একটা কথা কাটাকাটি হয়েছিল কদমের দিন চারেক আগে। তার জেরে কাপ্তান আর ফার্স্ট ইঞ্জিনিয়ার মিলে কি গালিটাই না দিল। তার উপর দিল তিন রাতের একষ্ট্রা ডিউটি। সেই একষ্ট্রা ডিউটির আজ প্রথম রাত।

ইঞ্জিনরুমের অয়েলম্যান, কদম ওদের সর্দার, ইঞ্জিন ঘরের ছোট সারেংয়ের পদমর্যাদায় এবং সৌহার্দের সম্পর্কেও শাস্তির ব্যাপারটা ওদের মাঝে একটা ছোটখাটো উত্তেজনার সঞ্চার করেছিল। আর সেই উত্তেজনার সম্মুখে পড়ে ওয়াদা দিতে হয়েছে কাপ্তানকে, শাস্তিটা এক রাতে কমিয়ে দেয়ার কথাটা বিবেচনা করবে সে।

কিন্তু ভোর হয়ে গেছে কখন, এখনো পাত্তা নেই কাপ্তানের। একে অন্যায় শাস্তি,গরমে সিদ্ধ হয়ে রাত জাগা, তার উপর কাপ্তানের নেই দেখা তাই মেজাজটা অমন খিচে গেছে কদমের।

শালার সাহেবগুলোই এমন, পায়ের উপর পা ফেলে খালি খবরদারী করবে। কথায় কথায় ড্যাম ব্লাডি সোয়াইন যা তা বলে মুখ খারাপ করবে। গালগুলো যেন ব্যাটাদের ভগবানের নাম। ভগবানের নামের মতো অষ্টপ্রহর জপে চলেছে, ড্যাম সোয়াইন।

কার উপর এমন নাখোস হলে ভাতিজা ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মন্ত্ত সারেংয়ের গলা পেয়ে বন্ধ হয় কদমের বিড়বিড়ানি। বলে, কার উপর আবার ওই শালা হিক্ সাহেব ?

আ-র হিক্ সাহেব। হিক্ সাহেব এখন হিক্কা তুলছে দেখে এসো। কেমন টেনে টেনে বলে মন্ত্ত সারেং।

হিক্কা তুলছে কেন ?

কেন আবার কি ? রাতভর 'চো চো' মদ গিলেছে, এখন বমি করছে।

মদ গিলেছে ? তবে যে ব্যাটা বলে গেল আমার ভবিষ্যত খারাপ ? বুঝি অবাক হয় কদম ! তা আর বেঠিক কি বলেছে। ভবিষ্যত তো খারাপই, মানে মন খারাপ আর মন খারাপ হলে মদ ছাড়া অন্য কি দাওয়াই আছে এই জাহাজে ?

মনটা খারাপ ? কাপ্তানের বিরুদ্ধে এতক্ষণের রাগটা যেন ঝুপ করে পড়ে যায় কদমের। মনটা ওরও মাঝে মাঝে কেমন খারাপ হয়ে যায়। মনে পড়ে যায় বামনছাড়ি গ্রামে সারেংবাড়ীর সেই ছনে ছাওয়া ঘরখানার কথা, নবিতুনের কথা। মনটা তখন শুধু খারাপ হয় না কেমন যেন বিগড়ে যায়। ভাল লাগে না কাজ কর্ম কারো সাথে কথা বলতেও ইচ্ছে করে না তখন। কদম সারেং বোঝে মন খারাপ হওয়াটা বড় যন্ত্রণার। এমন যন্ত্রণার সাথে আগে কখনো পরিচয় ছিল না কদমের। সাইত্রিশ ডিগ্রি দক্ষিণ ল্যাটিচ্যুড, পঞ্চান্ন বিশ লংগিচ্যুড বরাবর চলছে জাহাজ। বুঝি মন্ত্ত সারেংয়ের অনুক্ত প্রশ্নের জবাবেই বলল কদম।

তিরিশ বছরের অভিজ্ঞ নাবিক মন্ত্ত সারেং। পলকে মুখ ঘুরিয়ে দেখে নিল ছোট সারেংটিকে। কি এক আনন্দ খুশিতে উদ্ভাসিত মন্ত্ত সারেং-য়ের মুখখানি। ল্যাটিচ্যুড লংগিচ্যুডের হিসাব রাখা বা করা কদমের দায়িত্ব নয়। এ সবের দায়িত্ব নিয়ে ইঞ্জিনরুমের মাথায় বসে রয়েছে সেকেন্ড ইঞ্জিনিয়ার কদমের দুশমন সেই সাহেবের বাচ্চাটি। ওর কাজ ইঞ্জিনরুমের গ্রিজার 'অয়েলম্যান' খালাসি, ওদের সর্দারী করা। আর কদমের মতে, এ কাজে টিপ সইয়ের বেশী জ্ঞানের প্রয়োজন পড়ে না।

কিন্তু কদম শিখেছে। ওস্তাদ মন্ত্ত সারেং। কদম শিখেছে মুখে মুখে যেমন করে শিখেছে মন্ত্ত সারেং, তার ওস্তাদ আর এক সারেংয়ের কাছ থেকে এখন আত্মা যার বেহেশতে।

মুখে মুখে শিখেই পরীক্ষা দিয়েছে মন্ত্ত সারেং। সার্টিফিকেটও পেয়েছে। রুতুন্দা জাহাজে মন্ত্ত সারেংয়ের এটাই হয়তো শেষ খেপ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এর পরই মন্ত সারেং চাকরি নেবে সিংগাপুর, পেনাং অথবা হংকং লাইনে। সে জাহাজগুলো ছোট, ওই সার্টিফিকেটের বলে মন্ত সারেংই হবে সে সব জাহাজের সর্বময় কর্তা। কদম সারেংয়ের বাসনা, সেও শিখবে, পরীক্ষা দিয়ে সার্টিফিকেট নেবে, তারপর ছোট লাইনের কোন একটি ক্ষুদ্র জাহাজে সবচেয়ে গৌরবের আসনটিতে বসবে ও। তাই ইঞ্জিনরুমে এসে চোখ ওর স্থির হয়ে থাকে দিকমান যন্ত্রের কাঁটায়, ইঞ্জিনের বিচিত্র যন্ত্রবিন্যাসে।

মন্ত সারেংয়ের উৎসাহের হাতটা আস্তে আস্তে নেবে আসে ছোট সারেংয়ের কাঁধে। ছোট সারেংয়ের কাঁধে লাগে ছোট্ট একটা ঝাঁকি। মন্ত সারেং বলছে, সাবাস কদম সারেং, সাবাস। এভাবে শিখলে, আমি বলছি, শীগগীরই বড় সারেংয়ের উপর দিয়ে যাবে তুমি। কে রোখে তোমাকে।

বৃদ্ধ নাবিকের উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় হাসি খেলে যায় তরুণ নাবিকের মুখে। সে বুঝি তুষ্টির তৃপ্তির গর্বের হাসে। পায়ের নীচে উত্তাল তরংগ নাচন, প্রপেলারের একটানা পানি ভাংগার শব্দতান, ইঞ্জিনের ধাতব গর্জন—ওই একটি প্রশংসায় যেন সব কিছুরই রূপগুণ যায় বদলে। বদলে যায় নীরেট বস্তু আর যন্ত্রগুলোর একঘেঁয়েমী, কানে তালা দেয় গর্জনটাও। মনে হয় যন্ত্রে আর সমুদ্রে এ এক ঐক্যতান, পানির কল কল রবে যন্ত্র গর্জনে এ এক ঝংকার। আর মনে হয় ইস্পাতের ওই বিশাল দেহটা ওই চকচকে রড বিম—সবই ওর একান্ত আপনার, সবই ওর আপন কলজেরই অংশ।

এমন তো কখনো মনে হয়নি? এমন করে তো কোন দিন ভাবেনি তরুণ নাবিক? আপন কাজের প্রশংসা আর স্বীকৃতি পেলে সব জাহাজের সব নাবিকেরই বুঝি এমন মনে হয়।

এস ভাতিজা আরো শিখিয়ে দিই তোমাকে। মন্ত সারেং রুট ম্যাপটার দিকে নিয়ে যায় কদমকে।

পৃথিবীর মত সমুদ্র বন্দরের মানচিত্র। সমুদ্রের বুক চিরে চিরে লাল লাল সরু মোটা রেখা আন্তর্জাতিক জলপথের চিহ্ন।

এ পথ দিয়ে তো তুমি কখনো যাওনি 'এ্যাংরাজের' দেশে গেছ এ্যাডেন হয়ে। এই যে আমরা যাচ্ছি কেপটাউনের দিকে, এ পথ ধরেই উল্টা দিক থেকে এসেছিল ভাসকোডা সাহেব। পয়লা সাদা চামড়া, যে নাকি জাহাজে চড়ে পেঁছিল হিন্দুস্তানে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কান খাড়া করে মন লাগিয়ে শোনে কদম। এ সব কথা একেবারেই নতুন ওর কাছে।

মন্ত্ত সারেং বলে চলেছে, হিন্দুস্তানের ধন-দৌলত সোনা মাণিক হীরা জহরতের বড় লোভ ওই সাহেবগুলোর। কিন্তু জাহাজে করে হিন্দুস্তানে আসবার পথ জানা নেই ওদের। পালের জাহাজে বেরিয়ে পড়ল ভাসকোডা সাহেব।

পালের জাহাজ? অবাক হয়ে শুধাল কদম।

আরে হ্যাঁ, তখন কি ওই ইঞ্জিন ছিল, ওই প্রপেলার। এ সব তো অনেক পরের ব্যাপার।

সাগরে ভাসল পালের জাহাজ? ভয় করল না লোকটার? আবারও শুধাল কদম।

আর ভয়। হিন্দুস্তানের সোনাদানা শান শওকতের গল্প শুনে শুনে ওরা দেওয়ানা। লোভীর আবার ভয় আছে না কি?

আমাদের দেশে বুঝি তখন খুব সোনা ছিল মন্ত্ত চাচা?

কদমের প্রশ্নটা শুনে মৃদু মৃদু হাসে মন্ত্ত সারেং। বলে, সারা দেশটাই তখন সোনায় মোড়া ছিল রে, পথে পথে ছড়িয়ে থাকত হীরে মাণিক। কিসের অভাব ছিল তখন।

কান খাড়া করে মন লাগিয়ে শোনে কদম। সোনাদানার কথা, ওই দুঃসাহসী লোকটার কথা—সবই যেন কোন আজব দেশের তাজ্জব কিসসা। শুনতে শুনতে কেমন রোমাঞ্চের শিহরণ জাগে বুকে।

তা ওই পালতোলা জাহাজ চড়েই ভাসকোডা সাহেব আবিষ্কার করে ফেলল হিন্দুস্তানে আসার পথটা। তারপরের কিসসা তো একেবারে সাফ কিসসা। সাহেবগুলো এই পর্যন্ত লুটেপুটে খেল দেশের যত সোনা-দানা। ও সে জন্যই বুঝি আজ আমরা এত গরীব? হঠাৎ জিজ্ঞেস করল কদম। ওর কথাটার জবাব না দিয়ে দাড়ির ভেতর আঙ্গুল চালিয়ে গাল চুলকোয় মন্ত্ত সারেং। গাল চুলকিয়ে রুট ম্যাপটার সেই সরু মোটা লাল লাল রেখাগুলোর দিকে স্থির নজরে চেয়ে থাকে মন্ত্ত সারেং। চেয়ে কি এক ভাবনায় যেন ডুবে যায় মন্ত্ত সারেং।

কি হল চাচা?

এবারও কোন জবাব দেয় না মন্ত্ত সারেং। রুট ম্যাপটার দিকেই স্থির তার দৃষ্টি। বিগত দিনের সেই ধন-দৌলত হীরা-মাণিক্য উজ্জ্বল,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সোনা ছড়ানো দেশটার কথাই বুঝি ভাবছে মন্ত সারেং। বুঝি ভাবছে সেই শানদার অতীত কি আবার ফিরে আসতে পারে না ?

বুঝি ভাবতে ভাবতেই মানচিত্রের কাঁচের কেসটির উপর এক জায়গায় আঙ্গুল রাখল মন্ত সারেং। বলল, এই যে আমরা বলছি ২০ পূর্ব লঙ্গিচ্যুডে ঠিক আঠারোতে এসে জাহাজটা আমাদের ঘুরে যাবে ডাইনে। নোংগর ফেলবে কেপ শহরে। সেখান থেকে কোণাকোণি পাড়ি আটলান্টিক। এই যে দেখছ সাগরটা, এ আফ্রিকা ও-পারে আমেরিকা, ওর নাম আটলান্টিক মহাসাগর। বড় নচ্ছার এর পানি।

সমুদ্র যাত্রা, ষোল বছর থেকে মহাসাগরের বুকে বুকে যার দিন কাটে। দিন কাটে পানি কেটে কেটে ঢেউ ভেঙে। মহাদেশের বিলীন তটরেখার মতো পানির রাজ্যে হারিয়ে গিয়ে। কী এক আগ্রহে মানচিত্রটার উপর ঝুঁকে পড়ে কমদ সারেং।

মানচিত্রের স্বচ্ছ কাঁচের উপর আঙ্গুল টেনে টেনে বলে চলেছে মন্ত সারেং, ওই যে আমেরিকা মহাদেশ সেও ইউরোপীয় এক সাহেবের আবিষ্কার। নাম তার কলম্বাস। সাহেব বেরিয়েছিল হিন্দুস্তানের সোনাদানার খোঁজে, পেয়ে গেল আমেরিকা।

এ্যাঁ বল কি চাচা ? বিস্ময়ে যেন চোখ ফাটে কদমের। সাহেবরা এমন ভুলও করেছিল তা হলে ?

সেই আমেরিকা দেশ। দক্ষিণ আর উত্তর আমেরিকা। সেখানে তিনটে লম্বা বিশ্রাম আমাদের। তারপর এই যে দেখছ নিউপোর্ট সেখানে থেকে সোজা আটলান্টিকের ওপারে, রাণীর দেশে, সাবটমটম বন্দরে।

এত কিছু শুদ্ধভাবেই জানে এবং বলে মন্ত সারেং কিন্তু সাদাম্পটন বন্দরের বিকৃত উচ্চারণের উদ্ভট নামকরণটা বুঝি শোধরাতে পারবে না কখনো। ইঞ্জিনের মুখে খোলা চাতালের উপর থেকে মুখ বাড়িয়ে কি যেন বলল সেকেন্ড ইঞ্জিনীয়ার। অমনি মুখ চোখের রেখাগুলো কঠিন হয়ে উঠল মন্ত সারেংয়ের। দিকমান যন্ত্রের কাঁটাটা ঘুরছে আস্তে আস্তে। লম্বা বেড় নিয়ে দিক পরিবর্তন করছে রুতুন্দা। ভোঁ বাজার চাবিতে একটি টিপ দিল মন্ত সারেং। অপারেটারকে কি যেন একটু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংকেত পাঠাল। তারপর ইঞ্জিনের বিচিত্র কলকব্জাগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরখ করতে লেগে গেল। বলল কদমকে, যাও, সারা রাত জেগেছ। একটু শরবত খেয়ে ঘুম দাওগে।

যাবার জন্য সিঁড়ি ধরে কদম। কয়েক ধাপ নেবেও আসে। কিন্তু হিক্ সাহেবের ব্যাপারটা পুরোপুরি না জেনে কেমন যেন স্বস্তি পাচ্ছে না ও। সেই শোনার পর থেকেই জিজ্ঞেস করবে বলে ভাবছে; সাহসে কুলোচ্ছে না ওর। মন্ত সারেং তো শুধু রুতুন্দার বড় সারেং, কদমের উপরওয়ালা নয়? কদমের বাপজান মজল সারেংয়ের দোস্ত, সহকর্মী। সেই সূত্রেই মন্ত সারেং কদমের চাচা, মুরব্বীজন। তাই এক সাথে কাজ করেও একই কেবিনে শুয়েও কদমের সাথে মন্ত সারেংয়ের একটা সমীহ আর সংকোচের দূরত্ব।

আচ্ছা চাচা, হিক্ সাহেবের মনটা এতো খারাপ কেন? এক রকম মরীয়া হয়েই জিজ্ঞেস করে ফেলল কদম।

কেমন রহস্য করে হাসল মন্ত সারেং। বলল, ডারবানে নেবে চিঠি পেয়েছে, বৌর অবস্থা সংগীন। হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে বৌ।

আবার ইঞ্জিনের দিকে মন দেয় মন্ত সারেং। অনেকটা স্বগতোক্তির মতো বলেঃ শালার আবার বৌ। তার জন্য আবার মন খারাপ। আমি তো দেখে আসছি কলম্বো, এদিকে নাটাল, ওদিকে এ্যাডেন, সব জায়-গায়ই একটা করে ঠিকে বৌ রেখে দিয়েছে ব্যাটা।

সিঁড়িটা ধরে আস্তে আস্তে নেবে আসে কদম। মন্ত সারেংয়ের মন্তব্যটা বড় নির্মম বলে মনে হয় ওর। শাদা আদমিই হোক আর কালো আদমিই হোক, হাজার নোংরামি থাকুক মনের ভেতর, তবু বৌ বৌ-ই। বৌয়ের অসুস্থ-তার খবরে সব বর্ণের পুরুষদেরই তো মন খারাপ হয়। মন্ত সারেং যে কী। সাদা চামড়া বলে হিক্ সাহেবের মন খারাপ করতে নেই বৌর জন্য, মন্ত সারেংয়ের ভাবটা তাই। না, মন্ত সারেংয়ের বিদ্রূপোক্তিতে কদমের মনটা কিছুতেই সায় দেয় না।

বেলা বেশ বেড়ে গেছে। এ সময় দরজা জানালা বন্ধ করে কেবিনে নাক ডাকতে ইচ্ছে হল না কদমের। ও গেল ডেকের দিকটায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মালবাহী জাহাজ হলেও ডেকে এবং কেবিনে দু জায়গায়ই যাত্রী রয়েছে কিছু। বেশীর ভাগই গরীব হিন্দুস্থানী আর পাকিস্তানী। আফ্রিকার নানাজায়গায় ওদের রোজগারের ব্যবস্থা। পকেট ওদের বড় টান। তাই সস্তায় মালবাহী জাহাজেই সফর করে ওরা।

সবারই লম্বা সফর। কদমের সাথে কমবেশী পরিচয় ওদের সকলের। কেউ হয়ত খিঁচুরী পাকিয়েছে তারই একটু চেখে দেখতে হয় কদমকে। কেউবা ডাকে, গরম গরম চাপাটি আর গুড়ের একটু সাধ নিয়ে যাও সারেং। স্নেহের ধারাটি ওদের আকৃত্রিম। আত্মীয়তার পরশ ওদের কথায়, ওদের নৈকট্যে।

চৌতিরিশ থেকে পঁয়তিরিশ দক্ষিণ অক্ষাংশ আর আঠার উনিশ পুবের দ্রাঘিমার উত্তমাশা অন্তরীপের যতটুকু পানি বিশাল সমুদ্র জগতে স্থান তার অতি নগণ্য। কিন্তু জল স্থল মিলিয়ে যে বিরাট পৃথিবী সে পৃথিবীর ভূগোল আর ইতিহাসে অনেক জায়গা জুড়ে রয়েছে উত্তমাশা অন্তরীপ। সেই ইতিবৃত্ত কোন একদিন মুক্ত সারেংয়ের মতোই কণ্ঠস্থ হবে কদম সারেংয়ের। তরুণ নাবিককে উদ্দেশ্য করে সেদিন হয়ত কথার বান ছোটাবে কদম সারেং, বলবে এই সে উত্তামাশা অন্তরীপ ভাস-কোডা সাহেব এখানে এসেই অধীর আনন্দে চেঁচিয়ে উঠেছিল ওই যে, ওই যে. দেখা যায় হিন্দুস্তান।

কিন্তু আজ এই চৌতিরিশ থেমে পঁয়তিরিশ ডিগ্রি দক্ষিণ অক্ষাংশ আর আঠার উনিশ পুবের দ্রাঘিমায় জলভাগটুকুর উপর দাঁড়িয়ে শুধু একটি কথাই মনে পড়েছে কদমের, উত্তামাশা অন্তরীপ থেকে অনেক দূরে বামনছারি গ্রামের সারেংবাড়ী। অনেক দূরে বৌ নবিতুন আর ছোট্ট মেয়ে আক্কির মমতা জড়ানো গৃহ কোণটি।

বৌ ছেলে মেয়ে নিয়ে কেমন সংসার পেতে বসেছে ডেকের যাত্রীরা। ওদের সহজ ডাক, ওদের হৃদয়ের স্পর্শে অভিভূত হয় কদম। ওর মনে হয় উত্তামাশা অন্তরীপে এই রুতুন্দা জাহাজের বুকেও ওর জন্য রয়েছে নবিতুনের ছোট্ট সেই গৃহ কোণটির মমতার পরশ।

কদমের দল,—অবিরাম জলের বুকে ভেসে চলা মানুষ ওরা। ওরা নির্বান্ধব। ওরা নিঃসঙ্গ। অত আত্মীয় থেকেও ওদের যেন কেউ নেই! ভীষণ ভয়ঙ্কর হিংস্র সমুদ্রের মাঝে প্রাণটাকে হাতে লয়ে ওদের চলা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডাঙ্গার মাটি যে ওদের কেমন করে টানে সেটা হয়ত বোঝে না ডাঙ্গার মানুষ। ডাঙ্গার মানুষ বোঝে না জলের মানুষগুলোর বুকে কত দীর্ঘ-শ্বাস। বোঝে না নীড় বাঁধা ডাঙ্গার মানুষ ডাঙ্গার মানুষের একটুখানি হৃদ্যতা, একটুখানি মমতার জন্য কেমন কাঙ্গালের মতো লালায়িত জাহাজীর মানুষ। কিন্তু রুতুন্দা জাহাজের ওই ডেকের যাত্রীরা ওরা যেন বোঝে। তাই ডাক পড়ে কদমের। কদম যেন ওদেরই একজন। ডাঙ্গার মানুষের মমতার ছোঁয়ায় ধন্য হয় কদম।

মাদাগাস্কারে মরশুমী মজুর আবদুল আজিজ। বৌ আর ছেলেকে নিয়ে চলেছে কেপ শহরে। আজিজের বৌ ভাইয়ের সম্পর্ক পেতেছে কদমের সাথে, ভাই ডাকে কদমকে।

নেবে তো যাচ্ছি কেপ শহরে। কখনো কী দেখা হবে আবার ? কে জানে। বুঝি এখনি বিদায় নিচ্ছে আজিজ।

আলবৎ দেখা হবে। কদম যখন সারেং আর জাহাজের যখন পানি ছেড়ে আকাশে উড়বার কস্মিনকালেও কোন ভরসা নেই, তখন এপথ দিয়ে শতবার আসবে যাবে কদম। তখন দেখা হবে না ? আমার 'বইন' কি বলে ? কদমের সতেজ উৎফুল্ল ভাবে ওরাও যেন খুশী হয়ে ওঠে।

আজিজের বৌ পোঁটলা খুলে বের করে আনে মস্ত বড় থালার মত গোল চান্দা মাছের শুটকি।

বৌর হাতে শুটকিটা দেখেই হো হো করে হেসে দেয় আজিজ, বলে : জানো কদম, ভারী চালাক আমার বৌটি। শুটকি খাওয়ার সুবিধে হবে বলেই ভাই ডেকে বসেছে তোমায়।

আধো ঘোমটার তলা থেকে কটমটিয়ে তাকায় বৌটি। কদমের দিকে তাকিয়ে আগেও যেমন নিমন্ত্রণ দিয়েছে তেমনি আজো দাওয়াত জানাল। কদম খাবে ওদের সাথে। কদমের চুলোতেই রান্না হোক শুটকিটা। শুটকিটা নিয়ে নিজের কেবিনে পাঠিয়ে দেয় কদম। ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পা বাড়ায় কাপ্তানের এলাকার দিকে।

ডেকের উপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ভাবে কদম, বিচিত্র স্বাভাব মানুষ জাতটার। সারা জন্ম, কখনো বা জন্ম জন্ম কাটিয়ে দেবে ভিন্ন দেশে, তবুও স্বদেশে অভ্যাসটাকে পুরোপুরি ভুলতে পারে না ওরা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেবিনের বাইরে খোলা জায়গায় ডেক চেয়ারে বসে আছে কাপ্তান হিক্‌স। খালি গা। দু'হাতের তালুতে ন্যস্ত তার চিবুকটা। কি এক উদাসীনতায় চোখ স্থির সমুদ্রের বুকে।

কাছে এসে মনে হল কদমের, কাঁদছে হিক্‌ সাহেব। আরো কাছে এল কদম, দেখল, ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে হিক্‌ সাহেবের চিবুক বেয়ে। যেন চোখে পড়বার জন্যই একেবারে হিক্‌ সাহেবের সামনে এসে রেলিং ধরে দাঁড়াল কদম। অন্য সময় অসন্তোষের 'ভ্রূ' উঁচিয়ে একবার তাকাত কাপ্তান হিক্‌স। কিন্তু আজ এই রুতুন্দা জাহাজের শাসন শৃঙ্খলার ক্ষুদ্র জগৎটা ডিঙ্গিয়ে যেন অন্য কোন উদার বিশাল দুঃখময়ের জগতে পেঁছে গেছে কাপ্তান হিক্‌স। সেখানে অধস্তনের ত্রুটিগুলো উপেক্ষণীয়।

হঠাৎই বুঝি ওর দিকে নজড় পড়ল হিক্‌ সাহেবের। আর ওকে দেখেই ফোঁটা ফোঁটা অশ্রুটা ভাংগা সয়লাবের স্রোতের মতো নেবে আসে সাহেবের চোখ ঠেলে। চিবুক-ধরা হাতের তালু হয়ে কনুই বেয়ে নেবে যায় সেই অশ্রু সয়লাব। ঠিক এই মুহূর্তে কী করা যায়, ভেবে পায় না কদম।

আকস্মাৎ ডুক্‌রে কেঁদে ওঠে হিক্‌ সাহেব। অশ্রু ভরা গালটা গোঁ গোঁ অস্ফুট এক শব্দ তুলে যায়। অবুঝ কোন শিশুর মতোই ডেক চেয়ারে হেলান-পিঠে গড়াগড়ি খায় হিক্‌ সাহেবের মাথাটা। শরীরটা তার কী এক বেদনার পীড়নে অস্থির।

কাঁদতে কাঁদতে অনেক কথাই বলে গেল হিক্‌ সাহেব। কদম তার সব কিছু বুঝলও না, শুনলও না। কদম শুধু বুঝল, বলছে হিক্‌ সাহেব ঃ ও কডম! আমার ডার্লিং আমার ওয়াইফ আমার ডিয়ার রোজি বোধ হয় বেঁচে নেই।

সান্ত্বনা দেয় কদম। খামাখাই উতলা হচ্ছ সাহেব। তোমাদের দেশে তো ঔষুধ ডাক্তার কোনটারই কমতি নেই। তার উপর অভাব নেই তোমাদের টাকার। চিকিৎসা হচ্ছে বৌর, সেরে যাবে। শুধু শুধু কান্নাকাটি করে বুক ভাসাচ্ছ তুমি।

কিন্তু সান্ত্বনা পায় না সাহেব। বলে ঃ না না কদম, তুমি জান না। ও মরবে, আমিই মারলাম ওকে। আমিই মেরে ফেললাম, খুন করলাম। কডম, বড় ভাল মেয়ে ছিল রোজি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিল বলছ কেন সাহেব ? বল আছে, আছে।

আছে ? যেন আশ্চর্য হল কাপ্তান হিক্‌স।

হ্যাঁ আছে বৈই কি। সুনিশ্চয়তার স্বর কদমের।

না না, নেই রোজি বেঁচে নেই। ও কডম, আমি যে আসবার সময় ঝগড়া করে এসেছিলাম ওর সাথে। আবারও ডুকরে কেঁদে ওঠে হিক্‌ সাহেব। চেয়ারের বেতের পিঠে আছড়ে পড়ে তার মাথাটা।

অন্য সময়ে কোন সাহেবকে এমন করে কাঁদতে দেখলে হাসিই পেত কদমের। সাহেব মানেই উপরিওয়ালা, হুকুম দেনেওয়ালা; জবরদস্ত খিটমিটে দয়াহীন মায়াহীন। সেই সাহেবও কাঁদে তাও এমনি ডুকুরে ডুকুরে, ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে, হাউমাউ করে, মাথা কুটে ? এত যে সাহেবসুবো দেখেছে, সেই কদমের পক্ষেও এ এক দর্শনীয় বস্তু বটে।

কিন্তু হিক্‌ সাহেবকে কাঁদতে দেখে আজ হাসি পেল না কদমের। বরং কেমন এক মায়া জাগল আপন জনের স্নেহ-পরশ-বঞ্চিত, নীরস একঘেয়ে সমুদ্র জীবনে ওরই মতো নিঃসঙ্গ এই নাবিকটির জন্য। নবি-তুনের পাশাপাশি আর এক দেশের আর এক বিরহিনী বধূর মুখও বুঝি ভেসে উঠে কদমের মনের পর্দায়। সে মুখ অচেনা অজানা। কদম কখনো দেখেনি, কখনো দেখবে না হিক্‌ সাহেবের বৌকে। তবু মনে হয় ওর সে যেন ওর চেনা মুখ। নবিতুনের সাথে একটুও তফাত নেই তার, ওই গায়ের রংটুকু ছাড়া।

রাতভর ঘুমোয়নি হিক্‌ সাহেব। রাত জেগে মদ গিলেছে আর বুঝি চোখের জল ফেলেছে। কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়েছে, লাল মুখটা আরো লাল হয়েছে হিক্‌ সাহেবের। অত বড় একখানি বপু হিক্‌ সাহেবের। কিন্তু দূর ডাঙ্গার রুগ্না বধূর চিন্তায় কাতর হয়ে কেমন নেতিয়ে পড়েছে সেই বিশাল দেহখানি।

আর একটু মমতা আর একটু সহানুভূতির ছোঁয়া দেবার জন্য রেলিং ছেড়ে ডেক চেয়ারটির দিকে এগিয়ে এল কদম। কদম দাঁড়াল হিক্‌ সাহেবের চেয়ারটি ঘেঁসে। বলল কদমঃ সাহেব, তুমি একটা অবুঝ খোকার মতই কাঁদছ। মানে হয় কাঁদার ? আমি বলছি কেপ শহরে পৌঁছেই সুখবর পাবে তুমি। ভালই আছে মেম সাহেব।

এ্যা, যেন চৈতন্যহীনতার কোন গহ্বর থেকে আচমকা উঠে এল কাপ্তান হিক্‌স। অথবা কোন কিছুর উপর চোখ পড়ে চমকে উঠল,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্বিত পেল। বুঝি বিদ্যুতের কামড় খেয়ে উঠে দাঁড়াল হিক্‌স। উল্টে যাওয়া হাফ প্যান্টের কিনারটা সিদা করল। বেরিয়ে আসা হাফ সার্টের ঝুলটা ভাল করে ঢুকিয়ে নিল কোমরের নীচে প্যান্টের তলার দিকে। তারপর ফোলা চোখের মণিগুলো যেন কী এক ধৃষ্টতার জবাবে বার দুই কেঁপে গেল। মণিকাঁপা অশ্রুযুক্ত সেই চোখ জোড়া ক্ষণিক স্থির হয়ে থাকল কদমের মুখের উপর।

সাহেবের হঠাৎ ভাবান্তরে কেমন বোকা বনে যায় কদম। বোকার মতো চেয়ে থাকে সাহেবের মুখের দিকে।

গটগট জুতোর আওয়াজ তুলে কেবিনের দিকে চলে গেল হিক্‌ সাহেব। খট করে বন্ধ করে দিল কেবিনের দরজাটা।

কদম তখন মুখটা ঘুরিয়ে নিয়েছে দিগন্তবিসারি সমুদ্রের দিকে। সমুদ্রটা এখন কোথাও সাদা, কোথাও কালো, কোথাও ফিকে, কোথাও ঘনকৃষ্ণ। এ হল রোদ আর মেঘের খেলা সমুদ্রের বুকে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৫

না চাচা, মাপ কর। এ আমি পারব না। পাতলা অয়েল পেপারের মোড়কটা ফিরিয়ে দেয় কদম।

ভাইর ব্যাটার এমনধারা বেয়াদবিতে খুশি হবার কথা নয় মন্ত্ত সারেংয়ের। মুখটাকে কালো গোমরা এবং কিছুটা কঠিন করে বলল মন্ত্ত সারেং—এই কামটুকু করতে পারবি না, তবে তুই আমার কিসের ভাতিজা রে? তা ছাড়া আমদানী যা আসবে তার ভাগ তো তোকে দেবই বলেছি।

রাগলে কদমকে তুই বলে মন্ত্ত সারেং।

চাচা ভাগের আমার দরকার নেই। এ বড় খারাপ কাম।

খারাপ কাম? এমন উদ্ভট উক্তিতে সত্যি অবাক হয় মন্ত্ত সারেং।

হ্যাঁ খারাপই তো। কেমন গোঁয়ারের মতো বলে কদম। তারপর সেই খারাপটাকে আরো ব্যাখা নিয়ে বুঝিয়ে দেয়। এ হল গিয়ে বিঝাড়া, বেআইনী মাল। শুল্ককে ফাঁকি দিয়ে বন্দরে নিয়ে যাবে তুমি। এটা খারাপ কাম না?

এত বড় সমুদ্রটাকে হাতের তালুতে লয়ে খেলিয়ে বেড়ায় যে ঝানু নাবিক, সে-ই তো মন্ত্ত সারেং। তিন মহাসমুদ্রের কোন রহস্য অজানা নয় তার। অজানা সমুদ্রপথের নানা গুপ্ত সড়ক, বিচিত্র লেনদেনে আমদানি রপ্তানী আর এই সমুদ্রের বুকে ভেসে বেড়ায় যে জাহাজী তাদের মনের বিচিত্র খেলা মনের যতো অন্ধি সন্ধি অজানা নয় তিরিশ বছরের ঝানু নাবিক মন্ত্ত সারেংয়ের তাই হাল ছাড়ে না মন্ত্ত সারেং, বলে, অন্যায় নয়রে, অন্যায় নয়। এ কাম যে সবাই করে। যারা করে না তারা আহাম্মক, বেকুব। তারা ঠকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করুক সবাই। এ সব ঝন্ঝাটে নেই আমি। স্পষ্ট উত্তর কদমের।

আপন অজ্ঞতায় জব্বর সারেংয়ের নিষিদ্ধ মাল পাচার করতে গিয়ে তিনটি বছর যে জেল খেটে এল সেটা কোনদিন ভুলবে কদম? না কোনদিন ক্ষমা করবে জব্বর সারেংকে?

কদমের কাটা উত্তরটায় দস্তুরমত নাখোস হয় মন্তু সারেং। এ সব বিশেষ আর গোপনীয় কাজে সহায়তার জন্যই লোক নিয়োগের সময় বাছা বাছা বিশ্বাসী লোকই জাহাজে বহাল করে বড় সারেং। কিন্তু কদম যে এমন ধারা বেঁকে বসবে এটা কখনো ভাবতে পারেনি মন্তু সারেং।

একাধারে আমার দোস্ত আর মুরুব্বী ছিলেন মজল ভাই। তারই ছেলে তুই কদম। যেমন আমার নিজের ছেলে, তেমনি তুই। উমেদার কি কম ছিল? তবু তোকেই বহাল করলাম আমি। আর তুই কিচ্ছু না কাগজের একটা হাল্কা মোড়ক পকেটে ফেলে আমার সাথে সাথে নেবে আসবি বন্দরে, তাতেও তোর আপত্তি? আবার কত 'বক্তিমা' শুনাচ্ছিস। মন্তু সারেংয়ের কথায় এবার একটু খোঁচা, একটু অভিমানও।

নিরুত্তরে পায়ের নীচে জোড়া জোড়া কাঠের পাটাতনটার দিকে চেয়ে থাকে কদম।

যেদিন থেকে জাহাজের কামে ঢুকেছে কদম সেদিন থেকেই ওর পরিচয় বন্দরে বন্দরে অসংখ্য গোপন পথের এই বিচিত্র কেনা বেচার সাথে। এই করে বাড়িতে দালান তুলেছে মন্তু সারেং। একটা ছেলেকে বি. এ. পাস করিয়েছে। আর একটা ছেলেকে বসিয়েছে তেজারতে। এই করে কোলকাতার মতো শহরে তিন তিনটে বাড়ী কিনে এই রুতুন্দা জাহাজের বাটলার খবির মিয়া।

কিন্তু কদম সারেং? কদম সারেংয়ের মনে পড়ে বাপজানের কদম।

বাপজানের সাথে একই জাহাজে কদমের প্রথম সমুদ্রযাত্রা। আসরের নামায পড়ছিল বাপজান। জায়নামাযটার এক পাশে বসিয়েছিল কদমকে। কদমকে পশ্চিম দিকে মুখ করিয়ে এক রকম কসম খাইয়ে নিয়েছিল বাপজান। বলেছিল: বাবা, হারামের রুজিতে কখনো হাত দিবি না। হারাম খাবি না। হারাম ছুঁবি না। হারামের রুজিতে বরকত নেই। তারপর হাত তুলে নামায অন্তে মোনাজাতটা শেষ করেছিল মজল সারেং।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জায়নামাযটা গুটোতে গুটোতে বলেছিল আবার, যদি এ সব করিস তবে আমার ব্যাটা নস তুই।

আচ্ছা নে, আধাআধি বখরা। টোপের রশিটাকে আর একটু ঢিলে করে চোখের ঠারে হাসলো মন্ত সারেং। বলল আবার, উঠতি বয়স তোর। এদিকে ওদিকের খরচা একটু হবেই। যখন যা লাগে চেয়ে নিস। তোর জন্য আমার না নেই, বুঝলি? ব্যাপারটার যেন এখানেই ফয়সালা হয়ে গেল তেমনি করে কদমের কাঁধে হাত রাখল মন্ত সারেং। আর একবার চোখ টিপে হাসল। তারপর কেবিনের দরজাটা খুলে বেরিয়ে গেল।

বললাম তো চাচা এসব বদকামে আমি নেই। বখরা ফখরারও দরকার নেই আমার। উত্যক্ত হয়েই যেন বলল কদম। কিন্তু ততক্ষণে মন্ত সারেংয়ের পেছনে বন্ধ হয়ে গেছে কেবিনের দরজাটা। কদমের কথাগুলো কেবিনের ভিতরেই রয়ে গেল।

বিচিত্র স্বভাব এই জাহাজী মানুষগুলোর। যতক্ষণ ওরা সাগরের বুকে আপন তরীর নিরাপদ যাত্রায় কাণ্ডারী, তখন ওরা ধীর ওরা হুঁসিয়ার। ফুঁসে-ওঠা গর্জে-ওঠা সমুদ্র আর ভয়ঙ্কর তরঙ্গ আঘাতের মুখে ওরা নির্ভীক ওরা শান্ত। বড়ো দুর্যোগে টাল খাওয়া, ছিটকে পড়া তরীর মাঝে ওরা অকম্প, ওরা সাবধানী নাবিক। শক্ত হাতে ধরে থাকে হাল। অকুতোভয়ে পাড়ি দেয় দুর্যোগ।

কিন্তু তীরে পা রেখেই ওরা ভিন্ন মানুষ, বুনো মানুষ। ডাঙ্গার মাটির স্পর্শ পেয়ে হিতাহিত ন্যায়অন্যায় ভালমন্দ জ্ঞান যেন থাকে না ওদের। যতক্ষণ ওরা পানির রাজ্যে, তৃষিত চাতকের মতো চেয়ে থাকে ওরা, কখন দেখা যাবে মাটির রেখা, কখন পোতাশ্রয়ে এসে নোঙ্গর ফেলবে ক্লান্ত তরী। কিন্তু তীরের ক্ষীণ রেখাটি দৃশ্যমান হবার সাথে সাথেই ওরা অস্থির। তীরের হাতছানি ছাড়া আর সবকিছুই ভুলে যায় ওরা। মাটিতে পা রেখে ওরা উন্মাদ, বেপরোয়া, উচ্ছৃঙ্খল। তখন ওদের দেখে মনে হয় ওরা বুঝি হাজার হাজার বছরের ক্ষুধার্ত পশু, শিকার পেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে উন্মত্ত, সেই ক্ষুধার তাড়নায়।

হাজার ক্ষুধা, হাজার লালসা—লক্ষ মুখের লক্ষ হাঁ মেলে, লক্ষ নখরের ক্রুর তীক্ষ্ণতায় শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তৃপ্তি খোঁজে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তবু বুভুক্ষু নাবিকের ক্ষুধা কি মেটে? তৃপ্তি আসে? ক্লান্ত হয়?

রুতুন্দা জাহাজটা বন্দরে ভিড়াবার সাথে সাথে কী কাণ্ডটই না বাধিয়ে তুলল ওরা।

প্রথমেই নাবিক হিক্‌স। সাথে তার পেটোয়া ক্রু বাহিনীটি।

গোসল করে সাজগোজ করতে একটু দেরী হয়ে গেল কদমের। মাটিতে নেমে দেখল ধেই ধেই করে নাচছে হিক্‌ সাহেব আর ওকেই খুঁজছে।

নেবেই চিঠিপত্রের খোঁজ করেছে হিক্‌স। ভাল খবর। বৌ তার সুস্থ এবং নিরাময় হয়ে বাড়ীতেই আছে এখন। তাই আনন্দের চোটে রাস্তার উপরই নাচতে লেগেছে হিক্‌স। নাচতে নাচতেই ও জড়িয়ে ধরল কদমকে, বলল: কডম, তুমিই ঠিক বলেছ। বৌ আমার অল-রাইট। তারপর হিক্‌স কয়েকটা নোট গুঁজে দিল কদমের পকেটে। বলল আবার: কডম, আজ রাত নাবিকের রাত। ডু ফুর্তি। মৌজ বানাও। আমি যাই। আমার ডার্লিং অপেক্ষা করছে।

কদম কোন কিছু বলবার আগেই আঙিনা থেকে ওকে ছেড়ে দিয়ে দূরে দাঁড়ান এক শ্বেতাঙ্গিনীর দিকে এগিয়ে যায় হিক্‌স। তারপর মেয়েটার একখানি হাত বগলদাবা করে অদৃশ্য হয়ে যায় রাস্তার মোড়ে।

নতুন শুধু জায়গাটি, অন্য কিছু বুঝি নতুন নয় কদমের চোখে। এ হাটের বাতির ধাঁ ধাঁ, হাল্কা ফুর্তির উদ্দাম ফোয়ারা, দোকানীর হাসি বিলোল কটাক্ষ প্রসারিনী, সবই ওর চেনা। বল্গাহীন ফেনিল উন্মত্ত এই আনন্দের হাট দেখেছে হংকং-এ, এডেনে, সিংগাপুরে। ভূমধ্যসাগরের একাধিক বন্দরে। ওদিকে লণ্ডনেও। রক্তে রক্তে নেশা জাগানো, উন্মত্ততার তরঙ্গ ছড়ানো এই ফুর্তির হাট বুঝি সব বন্দরেই উপবাসী নাবিকের ক্ষুধা মিটাবার এমনি আয়োজন।

সমুদ্র তরঙ্গের ফেনায় কত উচ্ছ্বাস, কত আবেগ কত বিষ। সমুদ্রের ডাক প্রলয়ের ডাক। সমুদ্রের বুকে শুধু গর্জন আর আলোড়ন-শক্তির, ক্রুদ্ধ হিংস্র ভীষণ এক শক্তির আলোড়ন।

সাগরতরীর হুঁশিয়ারী কাণ্ডারী আপন অটলতার মাঝে বুঝি সঞ্চয় করে রাখে, ধরে রাখে সেই আবেগ, সেই উচ্ছ্বাস, সাগরবারির সেই ভীষণ শক্তির ক্রুদ্ধ উত্তেজনাটা। এমনি করে দিন যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারপর আসে তীরের ডাক, বন্দরেয় হাতছানি। আপন বুকে সঞ্চয় করে রাখা সমুদ্রের সে আদিম ভয়ংকরতার শক্তি লয়ে ওরা আছড়ে পড়ে তটের বুকে। লোকালয়ের শান্ত মাটিতে গোটা সমুদ্রটাকেই যেন তুলে এনে অকস্মাৎ ছেড়ে দেয় ওরা। ভেসে যায় বন্দর। ভেসে যায় বন্দরের আসপাশের পাড়াগুলোও। লোকালয়ের মানুষ বিরক্তিতে নাক সিটকায়, দোরে দেয় খিল। কিন্তু ওরা কি জানে কোন আদিম বিক্ষোভকে বুকের নিভৃতে বন্দী রেখে দিন কাটে নিঃসঙ্গ নাবিকের? ওরা কি খোঁজ রাখে কত অশ্রু মিশে থাকে সমুদ্রের লোনা জলে? ওরা জানে না বন্দরের ক্ষণিক নীড়ে মাটির গন্ধ খোঁজা নাবিক সমুদ্রেরই দীর্ঘশ্বাস।

কেউ চেনে না কদমকে। কেউ বিরক্ত করছে না ওকে। ভাল লাগে কদমের, পেট ভরে খেয়ে নিয়েছে ও। ভর্তি পেটের আরামে আস্তে আস্তে চায়ে চুমুক দিচ্ছে। চায়ের সাথে গিলছে সিগারেটের ধোঁয়া।

পায়ের নীচে ডাঙ্গার শক্ত মাটি। চারিপাশে ডাঙ্গার মানুষের ভীড়। ডাঙ্গার গন্ধ গরম আর টাটকা সব খাবার। সকল নাবিকের মতোই কানায় কানায় ভরে ওঠে কদমের মনটা।

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দেয় কদম। সিগারেট টানে। ধোঁয়া ছাড়ে। আর চেয়ে চেয়ে দেখে বাতি জ্বলা এই আনন্দ হাটের কত নেশা, কত রূপ, কত আকর্ষণ। এই নেশা এই আনন্দ মাটির। এই আনন্দ সকল নাবিকের। এই আনন্দ কদমের। বুড়ো হলেও ফুর্তির হাটে পিছিয়ে নেই মন্ত সারেং। জুটিয়ে নিয়েছে এক শ্বেতাঙ্গিনী সখী। টেবিলে বসে বীয়ার টানছে ওরা। অনর্গল কথা বলে চলেছে মেয়েটি। মাঝে মাঝে কি এক রসে হেসে ঢলে মাথাটা ছেড়ে দিচ্ছে মন্ত সারেংয়ের কাঁধে। অকস্মাৎ মাথাটা নিয়ে মন্ত সারেংয়ের সাদা পাকা দাড়িগুলোর প্রতি মনোযোগ দিয়েছে মেয়েটি। দাড়িগুলো নিয়ে খেলা শুরু করে দিয়েছে। যেন মহাকৌতুকের বস্তু খুঁজে পেয়েছে ও। মন্ত সারেং যেন খেলার পুতুল। খেলনা পুতুলের মতো বিনা প্রতিবাদে আপনাকে সপে দেয় মেয়েটির হাতে। মন্ত সারেংয়ের দাড়িগুলো মুঠোর ভেতর পুরে নেয় মেয়েটি, মুঠোর ভেতর কসলে যায় ঘন আগাছার মতো দাড়ির জঙ্গলটা! দু'হাতে ধরা দাড়িগুলো কাছে টেনে নেয় মেয়েটি। অমনিই যেন কোন স্প্রিং আটা পুতুলের মতোই এগিয়ে আসে মন্ত সারেংয়ের মুখ খানিও। আচমকা মুঠো খুলে হাতটা ছেড়ে দেয় মেয়েটি, যেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধাক্কা খেয়েই পিছিয়ে গেল মন্তু সারেংয়ের মুখ। খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে শেতাঙ্গিনী সখী।

চিকন একগোছা দাড়ি ঝুট করে টান মারে মেয়েটি। উহ্ করে সরে বসে মন্তু সারেং কিন্তু মুখে ওর সকৌতুক আনন্দ।

এবার ঘনিষ্ঠ হয়ে আসে মেয়েটি। মন্তু সারেংয়ের বিপর্যস্ত দাড়ির উপর বুলিয়ে যায় ওর চিকন আঙ্গুলের চিরুনী। চিকন আঙ্গুলে প্যাঁচিয়ে নেয় শুকনো খড়ের মতো দাড়িগুলো। খেলা করছে মেয়েটি আর কথা বলে চলেছে।

অবাক চোখে চেয়ে থাকে কদম। মন্তু সারেং আর ওর শেতাঙ্গিনী সখী। ওদের জাত আলাদা, ভাষা আলাদা। কত তফাত ওদের দুটো দেশের, ওদের গায়ের বর্ণের। কিন্তু সব তফাতকে এই মুহূর্তে যেন জয় করে নিয়েছে ওরা। পরস্পরের কথাগুলো বুঝতে একটুও যেন কষ্ট হচ্ছে না ওদের। ভাষার ব্যবধান এতটুকু অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারছে না ওদের ভাবের আদানে।

অথবা এ হ'ল সেই বন্দরের ভাষা যা বোঝে পৃথিবীর সকল নাবিক আর বন্দরের যত মেয়েমানুষ। অনাদিকাল থেকেই নাবিক আসে বন্দরে। এ ভাষায় কথা বলে নাবিক। এ ভাষায় ওদের বরণ করে নেয় বন্দরের ক্ষণ-প্রেয়সীরা। পূর্ববঙ্গের মেঘনা পারে আমতলী গ্রামে যার বাড়ী সেই মন্তু সারেং আর দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গী মেয়ে সেই আদ্যি-কালের ভাষাতেই বুঝি কথা বলে চলেছে ওরা।

রাত বাড়ছে। বাতির রোশনিটাও তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। উল্টো-দিকের সরু রাস্তা থেকে হল্লা আসছে, বন্দর নগরের পরিচিত নাবিক হল্লা। কদম দেখল রুতুন্দা জাহাজের দু'নম্বর সাহেব ডি সিলভা কোন কৃষ্ণাঙ্গিনীকে বগলে লয়ে বড় রাস্তা ধরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ফিটফাট পোষাক-পরা জনৈক শ্বেতাঙ্গ এসে দাঁড়িয়ে পড়ল মন্তু সারেং-য়ের টেবিল ঘেঁসে। বন্দরেরই কোন নিগূঢ় সংকেতে চোখে চোখে কি যেন কথা হয়ে গেল ওদের। লোকটি চলে গেল কাফের পেছন দিকে। মন্তু সারেং আর একটা বোতলের ফরমাশ দিয়ে কি যেন বলল ওর আজকে-রাতের প্রেয়সীকে। ঘাড় নেড়ে বুঝি সম্মতি দিল মেয়েটি। মন্তু সারেং উঠে এল কদমের টেবিলের দিকে। বলল, ভাতিজা একটু কথা আছে। একটু আগে শ্বেতাঙ্গ সাহেবটা যে দিকে মিলিয়ে গেছিল কাফের সেই পেছনের দিকটাতে কদমকে নিয়ে এল মন্তু সারেং।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেন আলাদা, কিন্তু কাফেরই একটি প্রসারিত অংশ এ জায়গাটুকু। একটু খোলামেলা, নিরিবিলি অন্ধকার। পাশাপাশি ছোট ছোট কতগুলো ঘর। ঘরের ভেতরে প্রায় না-জ্বলার মতো টিমটিমে আলো।

কদমকে নিয়ে একটি ঘরের পর্দা সরিয়ে ঢুকে পড়ল মন্তু সারেং। বসে আছে সেই সাহেবটি। নিজের দু'পকেট থেকে বড় রকমের দুটো কাগজের মোড়ক বের করল মন্তু সারেং। তারপর অকস্মাৎ কদমের লংকোটের পকেটেও হাত চালিয়ে দিল মন্তু সারেং। বের করে আনল সেই অয়েল পেপারে জড়ান মোড়কটি। হতভম্বের মতো চেয়ে রইল কদম।

তিনটি মোড়কই সাহেবের হাতে তুলে দিল মন্তু সারেং। এক তাড়া নোট ধরাই ছিল সাহেবের হাতে। নোটগুলো মন্তু সারেংয়ের হাতে ফেলে ত্বরিতে বেরিয়ে গেল সাহেব।

এ কী চাচা? আমার পকেটে ওটা কখন রেখে দিয়েছিলে তুমি? ছিঃ ছিঃ ধরা পড়ে গেলে কী কাণ্ডটা হত বল দেখি? বিমূঢ় ভাবটা কাটিয়ে চীৎকার করে উঠল কদম।

চুপ চুপ। ওকে এক রকম টানতে টানতে বাইরে নিয়ে এল মন্তু সারেং। বাইরে এসে বললো ও, বুঝলে ভাতিজা, চাচা ভাইপোর জন্য দুটো ঘরই ঠিক করে রেখেছি। এই যে দেখলে, এটা আমার। এর পরেরটা তোমার। এই দেখ। পাশের দরজার পর্দাটা সরিয়ে ফিটফাট বিছানার শূন্য ঘরখানা কদমকে দেখিয়ে দিল মন্তু সারেং।

কিন্তু.....

কদমকে মুখটা খুলতেই দেয় না মন্তু সারেং। আগের কথাটাই ছেদ না টেনে বলে চলেছে সে, যখন খুশি এসে পড় ঘরে। সারা রাত তোমার দখলে। আহা, এত শরম কিসের। চাচাই হই আর ভাইপোই হই, হলাম গিয়ে জাহাজী, জাহাজীদের অত শরম রাখলে চলে?

ওরা এসে পড়েছে বাতির নীচে।

নোটের সেই তারা থেকে কয়েকখানি নোট আলাদা করে নিল মন্তু সারেং। গুঁজে দিল কদমের পকেটে। কদমের মুখ থেকে ছোট্ট একটা প্রতিবাদ বেরিয়ে আসার আগেই নিজের টেবিলের দিকে রওনা দিয়েছে মন্তু সারেং।

কদমের বাপের দোস্ত মন্তু সারেং। কদমের শ্রদ্ধার জন মন্তু সারেং, শুধু বয়সের জন্য নয়, তার বিরাট অভিজ্ঞতা আর জ্ঞানের জন্যও। সাগরের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাড়িনক্ষত্র মন্ত্ত সারেংয়ের নখ দর্পণে। রুতুন্দা জাহাজটার সূক্ষ্ম যত কলকব্জা মন্ত্ত সারেংয়ের ইশারার দাস। কামেল, লায়েক, এলেমদার জাহাজী মন্ত্ত সারেং। সেই মন্ত্ত সারেং এমন ?

কেমন দমে যায় কদমের মনটা। ফেলে যাওয়া সেই টেবিলটা এখনো খালি। চেয়ারটা টেনে ধপ করে বসে পড়ে কদম।

ভাবতে গিয়ে অবাক লাগে কদমের। কানে শোনা আর চোখে দেখায় কত তফাত। মন্ত্ত সারেংয়ের বিচিত্র বেচাকেনার কাহিনী কতজনের মুখে কত বর্ণনায় শুনেছে কদম। তবুও ওর চোখে মন্ত্ত সারেং যেন ছোট হয়নি কখনো, যেমনটি হল আজ।

বিল মিটিয়ে দিল মন্ত্ত সারেং। তারপর শ্বেতাঙ্গিনী সখীটির হাত ধরে উঠে গেল কাফের পেছনে অন্ধকার সেই ঘরগুলোর দিকে। মেয়েটি এখন আর কথা বলছে না।

যেখানে উঁচু বেদী মতন জায়গায় ইংরেজী বাজনা বাজছে সেখানে বেদীতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটি মেয়ে। ও দেখছিল মন্ত্ত সারেং বেশ কয়েকটা কাগজের টাকা গুঁজে দিল কদমের পকেটে। সেই থেকে কী এক চোখে কদমকেই দেখে চলেছে মেয়েটি।

কদম মুখ তুলল। চোখাচোখি হয়ে গেল মেয়েটির সাথে। চকচকিয়ে গেল মেয়েটির মুখে নির্লজ্জ আমন্ত্রণ। মেয়েটির টকটকে লাল ঠোঁটে কামনা দুর্নিবার।

চমকে উঠল কদম। বিলোল-কটাক্ষ মেয়েটির মুখে বন্দরের ভাষা। মুখ ঘুরিয়ে নিল কদম।

আমন্ত্রণের জন্য অপেক্ষা করল না মেয়েটি। এসে বসল কদমের পাশের চেয়ারটিতে। চাইল একটু তৃষ্ণার পানি।

কদম এক বোতল বীয়ার আনিয়ে দিল ওকে। বীয়ারের বোতলটা শেষ করে কিছু খেতে চাইল মেয়েটি। বড় খিদে পেয়েছে ওর।

খাবার এল।

খেতে খেতে বন্দরের ভাষায় কথা বলে চলল মেয়েটি। একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে বসল মেয়েটি। কদমের হাতের পাশেই টেবিলের উপর রাখল বাম কনুইটি। শঙ্খশুভ্র বাহু মেয়েটির। শঙ্খশুভ্র বাহুর স্পর্শ লাগল কদমের হাতে। তুলোর মতো তুলতুল মেয়েটির বাহু। ফুলের পাপড়ির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মতো নরম তার স্পর্শ। সে স্পর্শটি লেগে থাকল কদমের বাহুতে।

আবারও চমকে উঠলো কদম। কিন্তু, সরে বসতে পারল না ও। পারল না শঙ্খশুভ্র তুলো-কোমল সে বাহুর স্পর্শের মায়া কাটিয়ে নিজের হাতখানি সরিয়ে নিতে। বন্দরের মেয়ের স্পর্শে কী এক যাদু।

পরম তৃপ্তির সাথে রয়ে রয়ে খেল মেয়েটি। খাবারগুলো শেষ হলে তাকাল কদমের দিকে। খেয়ে বড় তৃপ্তি পেয়েছে ও, খুশি হয়েছে, তারই জন্য ধন্যবাদ বিদেশী নাবিককে। কদম দেখল মেয়েটির চোখে সেই নিঃশব্দ ধন্যবাদ।

হঠাৎ মেয়েটির পেট ফুড়ে যেন গলগলিয়ে বেরিয়ে এল হাসি। রাশি রাশি হাসি। হাসির তোড়ে যেন এলোপাথাড়ি ছিটকে পড়ছে ওর হাত-গুলো, পাগুলো। হাসতে হাসতেই ওর মুখটা এসে ছুঁয়ে গেল কোটের কলারের উপর জেগে থাকা কদমের খোলা কাঁধটুকু।

অচিন মেয়েটির এমন দম ফাটিয়ে হাসবার এমন কি কারণ ঘটল ভেবে পায় না কদম। অবশেষে হাসির উপর লাগাম টেনে বললো মেয়েটি, তুমি কি বোবা নাকি গো। কথা বলছ না কেন? বলতে বলতেই লাগামটা হাতছাড়া হয়ে গেল মেয়েটির। আবার হাসছে ও।

হাসি আর কৌতুক, এ বুঝি বন্দরের মেয়েদের স্বভাবের অঙ্গ। কদমের মনে পড়ল মন্ত সারেংয়ের ক্ষণপ্রেয়সীর কথা। সেও মহা-কৌতুকে খেলছিল মন্ত সারেংয়ের দাড়ির ঝোপে আঙুলের সুড়সুড়ি চালিয়ে।

অচিন মেয়েটি এখনো হাসছে। হাসতে হাসতেই বুঝি মেয়েটির একখানি পা এসে বসে গেল, দেবে গেল টেবিলের নীচে কদমের উরুটার ওপর। আর সেই শংখশুভ্র বাহুখানা আরো সরে এসে লেগে থাকল কদমের বুকের সাথে। কদম নির্বাক।

এ বুঝি বন্দরের নেশা, বন্দরের ভাষায় বন্দর মেয়ের একান্ত আপন কথা। নেচে ওঠে রক্ত কণিকারা। কনকনিয়ে যায় শিরা উপশিরা। শিরায় শিরায় জ্বলে ওঠে কী এক দাহ। জ্বলে ওঠে সেই স্ফুলিঙ্গ কীটগুলো মাংসের নীচে অসংখ্য ঝিল্লীরন্ধ্রে যাদের গোপন বাসর। উগ্র উন্মত্ত এক নেশা, বন্দরের নেশায় চঞ্চল হয়ে ওঠে উপবাসী নাবিক কদম।

বস্তুপিণ্ডের একটি জড় জগৎ কদম সারেং। সে জগৎটাকে প্রচণ্ড

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আঁচে ঝলসে দেয় বন্দরের মেয়ে। ভীষণ এক শক্তি বন্দরের মেয়েটির। সে শক্তির টানে উৎক্ষিপ্ত ছিন্নভিন্ন কদম সারেং। সহসা সে শক্তিটি ওকে ধপ করে ফেলে দিল শক্ত মাটিতে। সরে বসল বন্দরের মেয়ে। আবারও খিলখিলিয়ে গা দুলিয়ে হাসল ও। বলল, আইসক্রীম খাওয়াবে ?

আইসক্রীম এল।

ওমা, কেমন লোক গো তুমি। এতক্ষণ না হয় একলাই খেলাম। এবারও একলাই খাব ?

আর এক পেয়ালা আইসক্রীমের হুকুম দিল কদম।

কিন্তু, অমন করে খিলখিলিয়ে হাসল কেন মেয়েটি ? হয়ত ভেবেছে মেয়েটি—একেবারে আনাড়ি আনাকোরা নাবিক-বন্দরের ঢং ফং বোঝে না কিছু। সে জন্যই কদমের মনে হল, কদমের মুখের দিকে তাকিয়ে অমন করে হাসল মেয়েটি।

বাহ্, ভারি চমৎকার আইসক্রীম। আর এক পেয়ালা খাওয়াবে না ? ...না না। দু'জনের জন্য। তুমিও খাও।

দু'পেয়ালা আইসক্রীম খেয়ে, চোখের নিঃশব্দ ভাষায় নয়, মুখ ফুটিয়েই কদমকে ধন্যবাদ দিল মেয়েটি। ধন্যবাদ দিয়ে বলল, এবার কফি খাব। কেমন অবলীলায় চেয়ে নেয় মেয়েটি। যেন চিরদিনের চেনা জানা, চিরদিনের ঘনিষ্ঠতা কদমের সাথে। অথবা এটাই রীতি বন্দরের দেশে। পরিচয় বাহুল্য, ভূমিকা অপ্রয়োজনীয় এখানে। সেজন্য বর্জনীয়। আমন্ত্রণের দরকার পড়ে না। এ রীতিই চলে আসছে আবহমান কাল থেকে, যেদিন ইতিহাসের প্রথম দুঃসাহাসী সপ্তডিঙ্গায় পাল উড়িয়েছিল নিরুদ্দেশের পথে সেদিন থেকে।

সেদিন থেকেই ক্লান্ত উপবাসী নাবিক খুঁজে নিয়েছে বন্দরের মেয়েকে। সেদিন থেকেই অপেক্ষা করে থাকে বন্দরের মেয়ে, কখন আসবে ওর নাবিকনাগর। বন্দরের মেয়ে আপন অঙ্গে তুলে নেবে প্রবাসী নাবিকের সমস্ত শ্রান্তি, ক্লান্তি নিঃসঙ্গতার যত বেদনা। আপন দেহের কোমল উষ্ণতা দিয়ে, আপন বুকের সুধা দিয়ে ভরিয়ে তুলবে নাবিকের শূন্য মন। তৃপ্ত নাবিক আবার পাড়ি দেবে সমুদ্রের অজানায়। তাই তো অত আবদার বন্দর মেয়ের।

তাই তো পরিচয় ওদের যুগযুগান্তরের, অনন্তকালের, মজল সারেংয়ের ব্যাটা কদম সারেং আর ওই শুভ্রবাহু মেয়েটির। তাই তো কদম সারেংয়ের রক্তে আজ আদ্যিকালের সেই প্রথম নাবিকের জাগরণ। প্রথম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাবিকের পিপাসা। গভীর হয়েছে রাত। গাঢ় হয়েছে বন্দরের নেশা। আর ওদের ক্ষণপ্রেয়সীরা জোড়ায় জোড়ায় বার রেস্তোরার হল ছেড়ে উঠে যাচ্ছে একটুখানি নিভৃতির খোঁজে। যারা এখনো রয়ে গেছে তাদের বোধ হয় শক্তি নেই দু'পায়ে দাঁড়াবার। ওদের নেতিয়ে পড়া মাথাগুলো কাঁধের উপর ধরে রেখেছে বন্দর মেয়েরা।

এবার বুঝি আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে বসল মেয়েটি। কদমের গলায় পরিয়ে দিল ওর শঙ্খশুভ্র হাতের বলয়। অন্য টেবিলের মেয়েগুলোর মতো সেও বুঝি আপন কাঁধে ধরতে চায় কদমের মুখের ভার, অনুভব করতে চায় ওর ঘন নৈকট্যের উষ্ণতা। আর তার উপর সব ভার ছেড়ে দিয়ে বিশ্রাম করুক, ঘুমিয়ে পড়ুক ওর ক্লান্ত নাবিকটি।

এতক্ষণে, বুঝি এই প্রথম মেয়েটিকে ভাল করে দেখল কদম। মেয়েটির চোখে চোখ রাখল কদম। চোখ রেখে যেন শিউরে উঠল, কেঁপে উঠল কদম। বন্দরের মেয়ের চোখে এ কোন সমুদ্রের ছবি দেখছে কদম? ওর নীল চোখের কোলে যে সমুদ্রের ফেনিল উন্মত্ততা। ওর গোটা দেহের ভাজ যেন সমুদ্রের তরঙ্গোচ্ছ্বাস, তরঙ্গে তরঙ্গে বেপরোয়া উদ্দামতার ডাক। ওর শরীরের উষ্ণতায় যেন সেই সাগরের আহ্বান, যে আহ্বানে ঝিনঝিনিয়ে যায় নাবিকের ধমনী। চঞ্চল হয় অস্থির হয় নাবিক। ঝাঁপিয়ে পড়ে ক্ষুব্ধ তরঙ্গ সেই উন্মত্ততার বুকে।

তবে কি বন্দরের মেয়ে নয় পোতাশ্রয়ের ক্ষণিক শান্তি? বন্দরের মেয়ে আর এক সমুদ্র ফেনিল? রুতুন্দা জাহাজের তরুণ নাবিক কদম, ওর রক্তেও যে সমুদ্রের স্রোত—অশান্ত, নির্মম। ও কেমন করে ঠেকিয়ে রাখবে আর এক সমুদ্রের দুর্নিবার আকর্ষণ?

বন্দরের মেয়েটির কাঁধে ঢলে পড়ে কদমের মুখখানি। কদমের মুখ কদমের ঠোঁট স্পর্শ পেল কী এক উষ্ণতার, তীব্রতার, উগ্রতার, যাদুকরী এক মাদকতার। বিশাল এক সমুদ্র বুঝি আর এক সমুদ্রের বুকে এসে আছড়ে পড়বে, দুই সমুদ্র লীন হবে অনন্ত বারির মহাকল্লোলে।

বাহুর কোমল বলয়ে কদমের মুখখানি ধরে রাখল মেয়েটি। কদমের মুখখানি কাঁধের উপর তেমনি ধরে রেখেই উঠে দাঁড়াল মেয়েটি। আস্তে আস্তে যেন পা ফেলল ওরা। পা ফেলল সেই আধো-আঁধারের নিভৃতির দিকে। কিন্তু.....নাবিতুন..... ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কদম যে কসম খেয়েছে। নবিতুনের কসম। তবে ?

মুহূর্তে ছিটকে এল কদম। ছিটকে এসে বসে পড়ল চেয়ারে। বসে বসে হাঁপিয়ে চলল দৌড় প্রতিযোগিতায় হেরে যাওয়া প্রতিযোগীর মতো। বুঝি অবাক বন্দরের মেয়ে। বন্দরের মেয়ে এমন নাবিক দেখেনি কখনো। কদমের পাশে এসে বসে ও। শুধায় কি হলো ?

এমনি সময় নৈশ-নেশার গাঢ় পর্দা ছিঁড়ে বেজে উঠলো তীক্ষ্ন হুই-স্‌ল্‌। বুকের মড়মড় কড়কড়, হৈ হাঁক, ব্যানটের অকারণ আস্ফালন। চারিদিকে পলায়নের হিড়িক। নিমিষের মাঝেই আনন্দের হাট রূপান্তরিত হল আতঙ্কের হাটে।

সাদায় কালোয় মেলামেশা করে রাজ্যের আইন ভঙ্গ করেছে বন্দরের মেয়ে আর ভিনদেশী নাবিক। তাই আইন রক্ষা করতে ছুটে এসেছে রাজ্যের কোটাল বাহিনী।

পলকে উঠে দাঁড়াল মেয়েটি। খপ করে ওর একখানি হাত ধরে নিল কদম। পকেট থেকে বের করল হিক্‌স আর মন্ত সারেংয়ের দেয়া সেই টাকাগুলো। টাকাগুলো গুঁজে দিল মেয়েটির হাতে।

কি যেন ভাবল মেয়েটি। তাকাল কদমের দিকে। আশ্চর্য হয়েই দেখল কদম, এখন সমুদ্র নেই বন্দর-মেয়ের চোখে। তিরোহিত সেই ফেনিল উন্মত্ততা' বন্দর মেয়ের চোখ স্নিগ্ধ। কী এক কৃতজ্ঞতার শিশিরে টলটল তার চোখের তারা। বন্দরের মেয়ে এখন যেন গৃহের বধূ নবিতুন।

এখনো ভাবছে মেয়েটি। নোটগুলো নাড়াচাড়া করল ও। উল্টিয়ে পাল্টিয়ে দেখল যেন। তারপর কম্পিত কুণ্ঠিত দু'টো আঙ্গুলে তুলে নিল মাত্র দুখানি নোট। ব্যাগের ভিতর ভরে নিল নোট দুখানি। কৃতজ্ঞতার ক্ষণিক দৃষ্টিতে ভিজিয়ে দিল কদমকে। বাকী নোটগুলো টেবিলের উপর রেখে ছুটে গেল দরজার দিকে।

ঘুরে দাঁড়িয়ে কদম বুঝি পা বাড়াল মেয়েটিকে ফিরিয়ে আনার জন্য। কিন্তু ততক্ষণে আইনের প্রহরীরা ঘিরে নিয়েছে ওকে। আইনের প্রহরী হাত বাড়িয়ে তুলে নিল টেবিলে পড়ে থাকা নোটের টাকাগুলো, অবলীলায় ছেড়ে দিল পকেটে। তারপর এক ধাক্কায় পাঠিয়ে দিল কদমকে খোলা দরজার বাইরে রাস্তার দিকে।

বন্দরের বিপণীতে শেষ রাতের অবসাদ। বন্দরের পথে কাঁচ ভাংগা, বোতল ভাংগা। বন্দরের আলো নিস্প্রভ, বুঝি রাতভর জেগে জেগে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখন একটু তন্দ্রার ঘোর লেগেছে ওদের চোখে। আস্তে আস্তে রাস্তার ভাংগা কাঁচ গুঁড়িয়ে জাহাজে ফিরে এল কদম।

শুয়ে শুয়ে বৃথাই এপাশ ওপাশ করল কদম। ঘুম বুঝি আসবে না আজ। বোজা চোখের সুমুখে বার বার ভেসে উঠছে একখানি মুখ। স্বচ্ছ আর স্পষ্ট করে কদম দেখতে চায় সে মুখ। কিন্তু নবিতুনের মুখখানি যেন কিছুতেই মনে করতে পারে না ও। যে মুখ ভেসে ওঠে সে আর এক মুখ, বন্দর-মেয়ের চটুল মুখ।

বিছানা ছেড়ে উঠে যায় কদম। খোলা ডেকটায় এসে দাঁড়ায় ও। চোখ দু'টোকে ছেড়ে দেয় বন্দর আলোর উল্কি আঁকা জলের বুকে। দূরে দেখা যায় একটি উপকূলবাহী জাহাজ। মনে হয় অনেকগুলো আলো হেঁটে হেঁটে চলে যাচ্ছে জলের উপর দিয়ে।

মাথার উপর তারাভরা আফ্রিকার আকাশ। পায়ের নীচে নৃত্যচঞ্চল সমুদ্র। কলকল ছলছল কি এক আনন্দগুঞ্জন।

নবিতুনের সম্পূর্ণ মুখটা কেন আজ মনে করতে পারছে না কদম? একটুখানি আভাস দিয়েই আবার যেন মিলিয়ে যায়। ভাসা ভাসা আদল, কপালটুকু অথবা ঠোঁটের কিনারে কেবেকার কাটা দাগ-জাগা চিবুকের অংশটুকু ভেসে উঠেই ডুবে যায়, ভেংগে যায় ঢেউয়ের বুকে বন্দর-বাতির ইলিবিলি রেখাগুলোর মতো। আর কি আশ্চর্য, সেই অস্বচ্ছতা, সেই অস্পষ্টতার আবছায়া ডিঙ্গিয়ে জেগে ওঠে শঙ্খশুভ্র নিটোল দু'খানি বাহু, নীল একজোড়া চোখ—স্পষ্ট, অতি স্পষ্ট সেই বন্দরের মেয়ে।

কি হলো কদম সারেংয়ের? বন্দরের মেয়ে কি যাদু করল ওকে? ভুলিয়ে দিল শান্ত-বৌ নবিতুনের মসৃণ পাটিপাতা-সহজ মুখখানি? যাদুকরী বিদেশিনী। এই যাদুকেই তো যত ডর নবিতুনের!

সমগ্র দুনিয়া জাহানের বিরুদ্ধে আশ্রাব্য যত গালিগালাজ বর্ষণ করতে করতে উঠে আসছে হিক্ সাহেব। অসংযত তার পা। ওর সেই বন্দর সঙ্গিনীর কাঁধে মাথা রেখে আস্তে আস্তে চলেছে। হঠাৎ পা ফসকে পাটাতনের উপর পড়ে যায় হিক্ সাহেব। অসহায় মেয়েটি চোখ ফেলছে এদিক ওদিক একটু সাহায্যের আশায়।

কদম গিয়ে উঠিয়ে নিল সাহেবকে। ওর কাঁধে ভর রেখে বলল হিক্ সাহেব ঃ কডম তুমি নাইছ বয়। আমার ডার্লিং পা ফসকে পড়ে গেছে, ওকে একটু সাহায্য করবে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেয়েটি হাসল।

বিরবিড়িয়ে রাগ ঝাড়ে কদম, পথে ঘাটেই শালার গণ্ডা গণ্ডা ডার্লিং।

হিক্‌স আর তার ডার্লিংকে কেবিনে রেখে এসে অকারণেই জাহাজটার এপাশ ওপাশ ঘুরে বেড়ায় কদম।

বন্ডেড অর্থাৎ শুল্কাধীন ঘরটার কাছে এসে থমকে দাঁড়ায় কদম। ফার্স্ট মেট ডি সিলভা আর মন্ত সারেং খুলে ফেলেছে সেই নিষিদ্ধ ঘর। অতি দ্রুত বের করে এনেছে প্লাই উডের কতগুলি বাক্স।

বাক্সগুলো ওরা নামিয়ে দিল নিচে অপেক্ষমান একটি স্টীমবোটে।

নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেল স্টীমবোট। দেখেও না দেখার ভান করে ওদের পাশ কাটিয়ে চলে এল কদম। উঠে এল ছাদে। ব্রীজটার উপর দাঁড়িয়ে আপনাকে ছেড়ে দিল হু হু হাওয়ার মাতনের মুখে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৬

মা মা, বাপজান আসছে।

আসছে ? বাইরে ? ঘরের দরজায় দু'দুটো ঠোকুর খেয়ে বিস্রস্ত শাড়ীর আঁচলটা কুড়োতে কুড়োতে বিরিয়ে এল নবিতুন।

কই, কইরে ?

ওদিক দিয়েই তো আসে, ঘাটার দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বলল আক্কি। আরো কিছু যেন বলবার ছিল আক্কির। কিন্তু শুনবার সময় কোথায় নবিতুনের। পড়ি মরি নবিতুন ছুটে এল ঘাটার দিকে।

সারেং বাড়ীর ঘাটার পূর্বে বিস্তীর্ণ ধানক্ষেত। ধানক্ষেতের ওপারে রাস্তা। সেই রাস্তা ধরেই আসে সারেং। দূর থেকে দেখা যায় তার হাতে টিনের সুটকেস, কাঁধে মাঝারি গেছের গাঁটরি! এক সময় রাস্তাটা ছেড়ে সারেং নেমে যায় ধানক্ষেতে। ধানক্ষেতের আলে কোণাকুণি পথ নেয় সারেংবাড়ীর ঘাটার দিকে। ক্রমে স্পষ্ট হয় তার রং-করা টিনের সুট-কেসটা। স্পষ্ট হয় গোলাপী সবুজে অথবা অন্য কোন রংয়ের বৈচিত্রে খোপ খোপ তবনটা; তবন দিয়ে বাঁধা কাঁধের সেই গাঁটরিটা। এবার খুব পরিষ্কার চেনা যায় কদম সারেংয়ের মুখটা।

সারেং বাড়ীর ঘাটায় পা রাখে কদম। পা রেখে কাঁধের গাঁটরি আর হাতের সুটকেসটা মাটিতে নামিয়ে রাখে কদম। তারপর পুকুরের পানিতে পা ডুবিয়ে আস্তে আস্তে মুখ ধোয়, হাত ধোয়, কুলি করে।

বুকটা ধড়ফড় করছে নবিতুনের। বছরের পর বছর প্রতীক্ষার সেই তীব্র ব্যাকুলতাটা ঠিক এই মুহূর্তেও যেন ধরে রাখতে পারছে না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজের ভিতর। ধরে রাখতে পারছে না অভাবিত অপ্রত্যাশিত আনন্দের কম্পনটা।

কত রকমে তাকায় নবিতুন। তাকায় কপালে হাত রেখে, তালুর ছায়ায় চোখের উপর পড়া রোদটাকে আড়াল করে। ভ্রূ নামিয়ে চোখ দুটোকে সুতোর মতো সরু করে। চোখ দুটোকে কচলে বড় বড় করে। কিন্তু, ধানক্ষেতের সোনালী বিস্তার আর এই রাস্তার ধু ধু এ ছাড়া আর কিছুই তো নজরে পড়ে না নবিতুনের।

ধান কাটার মরসুম চলছে। এখানে সেখানে খালি গা কিষাণ উপুড় হয়ে মাথা নিচু করে ধান কেটে চলেছে। কেউ বা ধান কাটা সারা করে ইতিমধ্যেই রবিখন্দের আয়োজন শুরু করেছে। ওরা ছাড়া আর কোন লোক নেই, ক্ষেতেও না রাস্তায়ও না।

তবু চোখের কোণে দুনিয়ার যত আগ্রহ আর ব্যাকুলতা ঢেলে ওই কিষাণদেরই দেখে নবিতুন। দেখে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে, দৃষ্টির আগায় তীক্ষ্ণতার শক্তি টেনে। যেন ওদেরই যে কোন একজন যে কোন মুহূর্তে হয়ে যেতে পরে কদম সারেং। না, ওরকম অত্যাশ্চর্য আর অলৌকিক কোন কিছু ঘটে না জীবনে। ধু ধু রাস্তাটার উপর আবার চোখ রাখে নবিতুন।

ধু ধু টার দিকে ঠায় তাকিয়ে থাকে নবিতুন। তাকিয়ে তাকিয়ে বুঝি পানি এসে যায় চোখে। আঙুলের পিঠ দিয়ে চোখ কচলায় নবিতুন। হঠাৎ মনে হয় নবিতুনের, আক্কি ভুল খবর আনেনি তো? কার কাছেই বা খবরটা পেল আক্কি।

আক্কি খবরটা তুই কোথায় পেলিরে?

আক্কির উত্তরটা শুনে এতক্ষণের উদ্বেল হওয়া বুকটা ওর যেন ধপ করে বসে পড়ল। আক্কি যা বলল তার সরলার্থ—পিয়লগাছার এক দোকানদারের ভাই, সে গেছল ওর মামার বাড়ী বেড়াতে। ওর মামার বাড়ীর কোন এক লোক জাহাজের সুকানি। সেই সুকানি বলেছে কদম আসছে দেশে।

তুই কার কাছ থেকে শুনলি? আক্কির লম্বা বয়ানটা থামিয়ে দিয়ে অসহিষ্ণু স্বরে শুধায় নবিতুন।

পিয়লগাছার সেই দোকানদারের ভাই ফিরে এসে গল্প করেছে দোকানে। সেই দোকানে তখন বসা ছিল কদুরখিলের বেপারি বাড়ীর বুড়ো বেপারি। বামনছাড়ির হাটবারে বেপারির কাছ থেকে অনেকেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথাটা শুনেছে। আক্‌কি এই মাত্র শুনে এল মিজি বাড়ীর পাঠশালায় পড়া আক্‌কির বয়সী মেয়েটার কাছ থেকে।

হা আল্লা, এতক্ষণ বলিসনি কেন। দোষটা যেন আক্‌কিরই!

মুখটা নীচু করে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে আক্‌কি, আর পায়ের আঙ্গুলে ঘাসের দলা পাকিয়ে চলে।

দমে গেল নবিতুন। এত মুখ ঘুরে কি খবর কি হয়ে এসেছে কে জানে। সারেং আসবে, সারেং আসছে! সত্য হোক মিথ্যে হোক, আপন মনকে এতক্ষণ ধরে এ কথাটাই তো বিশ্বাস করিয়ে আসছিল নবিতুন। আর মন যেন হাজার কণ্ঠে সাড়া দিয়েছিল, হ্যাঁ সারেং আসছে, সারেং আসছে। মনের সাড়া পেয়ে বুকটাও বুঝি নেচে উঠেছিল। আশার আনন্দের অধীরতার উদ্বেল তরঙ্গ দৌড়ে গেছিল। বুক উপচে, গা ভাসিয়ে। এক নিমেষে উবে গেল সেই আশা, বিশ্বাস, আনন্দ অধীরতা।

তবু কী আশ্চর্য! মাঠের ওপারে সেই পথটার দিকে চেয়ে থাকে নবিতুন। রোদ বাড়ছে। দূর রাস্তার ধুলোটাও অসহ্য ঠেকছে চোখে। রোদের ঝিকিমিকির আড়ালে রাস্তাটা দেখা যায় কি দেখা যায় না। তবু স্থির নজরে তাকিয়ে থাকে নবিতুন। নবিতুন কি ভাবে ধু ধু রোদের ধাঁ ধাঁ থেকে এখুনি উঠে আসবে ওর প্রবাসী নাবিকের মুখ?

এক সময় টন টন করে ওঠে চোখ জোড়া। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঝিঁ ঝিঁ ধরে পায়ে। ধীর পায়ে মেয়েটির হাত ধরে ঘরে ফিরে আসে নবিতুন। ঘরে ফিরে বেড়াটার গায়ে হেলান দিয়ে একতাল অবসাদের মতো বসে নবিতুন। শুধু অবসাদ নয় ওর গোটা শরীরটাই কী এক ভার যেন। এতক্ষণের অধীরতা, অস্থির প্রত্যাশার উত্তেজনা, সবটাই এখন যেন জড় জমাট পাথর। সে পাথরের চাপে বুঝি ভেংগে পড়বে নবিতুন।

আক্‌কির মাথায় আস্তে আস্তে হাত বুলায় নবিতুন। ওর কোলে মাথা রেখে মাটিতে ঘুমিয়ে পড়ে মেয়েটি। বাপের মতো মুখ পেয়েছে আক্‌কি। সে মুখের দিকে অপলক চেয়ে থাকে নবিতুন।

সেই নাক, সেই চোখ, এমন কি চিবুকের সেই কুঞ্চনটুকুও। লোকে বলে যে মেয়ে পায় বাপের গড়ন সে নাকি লক্ষ্মী, ভাগ্যবতী। আহা, তাই যেন হয় আক্‌কি। পুতেঝিয়ে ঘরে খামারে লক্ষ্মীবতী হোক আক্‌কি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নবিতুন পেয়েছে মায়ের শ্রী, মায়ের মুখ। এই শ্রী মুখটাই বুঝি কাল হল ওর। লুন্দর শেখের বদ নজর, গ্রামের যত গুণ্ডা সান্ডার কুই, রাত বিরেতের উপদ্রব, সবই ওই ঢক নকসার শরীর আর কালো মুখের শ্রীটার জন্য।

আক্ষেপ হয় নবিতুনের। খেদ জাগে। যদি পেত বাপের ঢক, গায়ে বা মুখে কোথাও একটুখানি বাপজানের নমুনা, তবে বুঝি এত দুর্দশায় পড়ত না নবিতুন। ভাগ্যবতী হত নবিতুন, সুখের ঘরে হেসে খেলে জনম কাটত।

আক্‌কির বাড়ন্ত শরীরটার দিকে তাকিয়ে অন্য চিন্তা জাগে নবিতুনের। দশে পড়েছে আক্‌কি। কথায় বলে, এগারোয় মেয়ে সেয়ানা, বারোয় মেয়ে বিয়ের লায়েক। এই তো শুনে আসছে নবিতুন। এই তো নিয়ম। তা ছাড়া আক্‌কির গড়ন পিটন বড় তেজাল। এই দশেই মনে হয় বিয়ের লায়েক। কিন্তু একা একা কী করবে নবিতুন? এ এক চিন্তা নবিতুনের যা মনে জাগলে চোখে অন্ধকার দেখে ও। নিজের কষ্ট, খবর-না-পাওয়া খসমের দুশ্চিন্তা সব কিছুর উপরে আক্‌কির ভবিষ্যতের চিন্তা।

নবিতুন আর ভাবতে পারে না। মেয়ের মুখ, খসমের মুখ সবই যেন ঝাপসা হয়ে যায়। কী এক হাহাকার কেঁদে ওঠে ওর বুকের ভেতর। বুকটা ওর ফেটে যায়। চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসে কান্না। এত কান্নাও জমে থাকে একটি বুকে? দিনে রাতে কতবার কান্নার ঢল নামে নবিতুনের বুক বেয়ে। কান্নার যেন শেষ নেই। কান্না আসে সারেংয়ের মুখটা মনে করে, মেয়ে আক্‌কির ভবিষ্যত ভেবে।

মেয়ে আক্‌কির সাধ একটা নতুন শাড়ী পরবে ও। মায়ের তালি দেয়া পুরনো শাড়ী আর ভাল লাগে না ওর। কান্না পায় নবিতুনের —সোনা মাণিকের একটিমাত্র আবদার মিটাতে পারে না বলে! কান্না আসে নিজের পোড়া কপালটার কথা ভেবে। এত দিনের এত বছরের এ কান্না তবু কেন হালকা হয় না নবিতুনের বুকটা? তবু কেন ঠাণ্ডা হয় না চোখের জ্বালা, মনের জ্বালা?

আঁচলে চোখ মোছে, মুখ মোছে নবিতুন। কোল থেকে আক্‌কির মাথাটা তুলে নেয়, জাগিয়ে তোলে ওকে। বলে নবিতুন, দরজা ভেজিয়ে ঘুমোস মা। অনেক দেরী হয়ে গেল। চৌধুরি বিবি আজ আর আস্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাখবে না। ঘোমটাটা কাঁধ অবধি টেনে বেরিয়ে পড়ে নবিতুন।

চৌধুরী বাড়ীর কামটা দাসীর কাম। কিন্তু, কাম-কাজ সেরে নিজের ভাতটা লয়ে বাড়ী ফিরতে পারে নবিতুন। রাত্রে বাড়ীতেই থাকে ও। দাসীগিরির সাথে এটুকুই তফাত। এই তফাতটুকুই যেন নবিতুনের মান ইজ্জত আর আব্রুর নিশ্চিত দলিল।

গুজাবুড়ি আর পেটের জ্বালায় চারিদিকে যখন অন্ধকার দেখছিল নবিতুন ঠিক সেই সময়ই চৌধুরী বাড়ীর কামটা পেয়ে গেছিল নবিতুন। তাই আকাশের দিকে দুহাত তুলে দোয়া মাগে নবিতুন, আল্লা যেন চৌধুরীদের বেহেশত নসিব করে।

কিরে নবিতুন, তোর সারেংয়ের খবর-টবর পেলি? চোখে মুখে স্বরে কুৎসিত এক ইঙ্গিত টেনে শুধায় ছোট চৌধুরী। জড়োসড়ো ঘোমটা টেনে পাশ কাটিয়ে চলে যায় নবিতুন।

কথা যেমন বাঁকা, মুখ যেমন খারাপ ছোট চৌধুরীর তেমনি নজরটাও তার বড় বদ। কেমন বদ চোখে তাকায় ছোট চৌধুরী। হিম হয়ে যায় নবিতুনের গাটা। বড় ভয় করে ওকে।

রোয়াকের ওধারে বসে চৌধুরী বড়বৌ। ছোট দেওরের কথাটা বুঝি কানে গেছে তার। সে কথারই জের টেনে কি এক রস চটকে বলে বড় বৌ, আ-র সারেং। খোঁজ করে দেখগে, কোথায় কয়টা সাংগা করে বসে আছে।

তা আর বিচিত্র কি? ছোটলোকদের তো কামই এই। আজ একে ছাড়ছে কাল শাদী করছে? ভাবির সাথে গলা মেলায় ছোট দেওর।

ঘরের ভেতর কানে আঙ্গুল দেয় নবিতুন। স্বামী পরিত্যাক্তা বধুর কত যে লাঞ্ছনা, কত যে দুঃখ সে কি বুঝে ওরা? তবু কেন অমন করে কথার বাণ ছুঁড়ে মারে ওরা? ওদের দিলে মহব্বত নেই, দয়া নেই, ভাবে নবিতুন। তাছাড়া নবিতুনের খসম তো আর সত্যি সত্যি ছেড়ে যায়নি ওকে। বিদেশ করে ফিরতে দেরী হচ্ছে, এই যা।

ওমা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এ আবার কি ঢং! বলি, দাঁড়িয়ে থাকলেই চলবে নাকি? কখন আবার মেঘ করবে, চালের গুড়িগুলো রোদে দিবি না? খেঁকিয়ে ওঠে চৌধুরীবিবি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কখন যে চৌধুরীবিবি এসে পড়েছে ঘরের ভেতর লক্ষ্য করেনি নবিতুন। এই আসছি, ছোট করে বলে নবিতুন। তারপর বড়বৌর বাচ্চার মুত আর মলের তেনাগুলো লয়ে চলে যায় পুকুরের দিকে।

উঠতে বসতেই কামের তাগাদা চৌধুরীবিবির! তার যা বকাঝকা গালিগালাজ, সে ওই কামের জন্যই। শুনতে শুনতে গা-সহা হয়ে গেছে নবিতুনের। আজ মনে হল বড়বৌ আর ছোট চৌধুরীর বাঁকা হাসি বাঁকা কথার তুলনায় চৌধুরীবিবির বকাঝকাটা বুঝি মিষ্টি কথায় আদর। কাজ করতে করতে আজ বড় আনমনা হয়ে যায় নবিতুন। আন-মনা কত কী যে ভেবে চলে! হদ্দ থাকে না সে সব ভাবনার।

কাজ করতে করতেই মনটা যেন ওর নেচে ওঠে। মনটা যেন কথা কয়ে ওঠে। আবার সকাল বেলার সেই প্রত্যাশা অধীর কম্পনটা জেগে উঠেছে বুকের ভেতর! উদ্বেল ঢেউয়ের মতো ওঠে আর নাবে নবিতুনের বুকটা। ওবেলা না হয় আসেনি সারেং। কিন্তু বিকেল বেলা আথবা রাত্রে? যে কোন সময়ই তো এসে পড়তে পারে সারেং। এসে দেখবে নবিতুন নেই ঘরে। ছিঃ ছিঃ এ কথাটা এতক্ষণ চিন্তা করেনি নবিতুন? দৌড়ে দৌড়ে জলদি হাত চালিয়ে কাজগুলো সেরে ফেলল নবিতুন। তাড়াতাড়ি বেলা থাকতে থাকতেই ওকে ফিরতে হবে বাড়ী। বার বার নিজেকে ধিক্কার দেয় নবিতুন। সকাল বেলা খবরটা যখন পেলই, আজ কাজে না এলেই বা কি হত?

খবর না দিয়ে আচমকা সারেং যে এসে পড়ে না এমন তো নয়। সেই যেবার অসুখ করেছিল নবিতুনের, জীবনে ওই একবার তো অসুখ করেছিল ওর। সেবার তো আচনক রাতের বেলায়ই এসে হাজির সারেং। অসুখে দুর্বল শরীর নিয়ে সাঁজ রাতেই ঘুমিয়ে পড়েছিল নবিতুন। রাত বোধ হয় এক ঘড়িও পার হয় নি। বুঝি ঘুমের ঘোরেই নবিতুন শুনল, বৌ বৌ। ঘুম ভেঙ্গে ধড়ফড়িয়ে উঠল নবিতুন। কান পেতে স্পষ্ট শুনল বৌ বৌ। এ যে ওর সারেংয়ের গলা। দরজার খিল খুলে উঠোনে ছুটে এসেছিল নবিতুন।

আহা, আজও তো রাতের পয়লা কি দোসরা ঘড়িতে সারেং এসে তেমনি করে ডাকতে পারে, বৌ বৌ।

সানকিতে মেপে দু মালা ভাত দিল চৌধুরীবিবি। ভাতের পাশে দিল এক করসুল সালন। ভাতের উপর দিল দু করসুল ডাল!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সানকিটাকে আঁচলের তলায় নিয়ে ছোটবৌয়ের ঘরের দিকে গেল নবিতুন। ছোটবৌ খুব ভালো। এত ভালো যে তার কাছে কোন কিছু চাইতে লজ্জা হয় নবিতুনের। যদি কোন কারণে অপারগ হয় ছোটবৌ? কিন্তু আজ সকল লজ্জা শরমের মাথা খেয়ে হাত পেতেছে নবিতুন। বেশি এক পোয়া চাল চেয়েছে ছোটবৌর কাছে। অবাক হয়েই শুধিয়েছে ছোটবৌ, হঠাৎ তোর চালের দরকার পড়ল কেন রে?

মিথ্যা বলেছে নবিতুন। বলেছে, খোলায় করেই ভেজে খাব।

যাবার সময় নিয়ে যাস, বলেছে ছোটবৌ। আর বোধ হয় নবিতুনের এই হঠাৎ জাগা সখটার কথা ভেবে ছোট্ট করে একটু হেসেছে ও।

ঘরের দরজায় আসতেই ছোটবৌ তেনায় বাঁধা চালগুলো সন্তর্পণে তুলে দেয় ওর হাতে। ফিসফিসিয়ে বলে, সানকিতে রেখে ঢেকে ফেল আঁচল দিয়ে। ওই বুড়ি দজ্জালিটা দেখলে পর রক্ষে থাকবে না।

সে কি আর জানে না নবিতুন? আড়াআড়ি তেনার পুঁটুলিটা সানকির ভাতের উপর রেখে আঁচল চাপা দেয় নবিতুন। আড়চোখে একবার দেখে নেয় দূরে দাওয়ায় দাঁড়ানো দজ্জালি বুড়ি চৌধুরীবিবিকে। তার পর এক রকম দৌড়াতে দৌড়াতেই রওনা হয় বাড়ির দিকে।

কত মুখ ঘুরে ঘুরে কী খবর হয়ে ওর কানে পেঁছেছিল সকাল বেলায়, নবিতুন এখন ভুলে গেছে। ভুলে গেছে চৌধুরী বাড়ী আসবার পথে সে যে গেছিল মিজি বাড়ী। মিজি বাড়ীর সেই মেয়েটা, সারেং যে আজই আসবে এমন কোন কথা শোনেনি সে। মেয়েটির ভাই, সেই শুনেছে হাটুরেদের মুখে, কে নাকি কদমকে দেখে এসেছে খিদিরপুরে। খিদিরপুরে যখন দেখা গেছে কদমকে, তখন নিশ্চয় দেশের দিকে রওনা দেবে ও। হয়ত এটুকুই বলেছিল সেই নাম-না-জানা হাটুরে।

কিন্তু এ সবই ভুলে গেছে নবিতুন। সেই যে সকাল বেলায় মনকে একবার বিশ্বাস করেয়েছিল সারেং আসছে, মন আবার সে কথাটাই বলতে শুরু করেছে। মন বলছে সারেং আসছে।

সারেং আসবে আর যোগাড়যন্তর রেখে তৈরী থাকবে না নবিতুন? তৈরী নবিতুন। এখন ওর হাতে একপোয়া চাল। মানুষটি এলে এক্ষুণি চারটে গরম ভাত ওকে ফুটিয়ে দেবে নবিতুন।

এত তাড়াতাড়ির পরও বাড়ী পেঁছে নবিতুন দেখল বেলা প্রায় ডুবডুব। হাঁস দুটোকে পেছন পেছন তাড়া দিয়ে ঘরের দিকে নিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসছে আক্‌কি। মোরগ আর মুরগীগুলো ঘরের ভেতর মাথা গুঁজে বসে আছে দাওয়ায়। ঘরে যাবার যেন ইচ্ছে নেই ওদের।

হাঁস দুটোকে ধরে ফেলল নবিতুন। গলা ধরে দুহাতে দুটোকে উঁচিয়ে তুলল, ওজনের আন্দাজ নিল। ভারি চর্বিদার আর ওজনী হয়েছে হাঁস দুটো। কিন্তু না, সেদ্ধ হতে বড় সময় নেয় হাঁসের গোশত। তাড়াহুড়োয় রাঁধতে হবে, অতএব হাঁস দুটোকে ছেড়ে দেয় নবিতুন। ধপ করে মাটিতে পড়েই আস্তানার দিকে দৌড় মারে ওরা।

দাওয়ায় উঠে মুরগীগুলোকে ডানা ধরে তুলে তুলে দেখে নবিতুন। কোঁ কোঁ করে প্রতিবাদ জানায় ওরা। দেখে শুনে ডেঁগি মোরগটাকে পছন্দ করে রাখে নবিতুন। যেমন কচি তেমনি তাজা ডেঁগি। আঁচ লাগতেই সেদ্ধ হয়ে যাবে। রাত এলো। চেরাগে কেরোসিন ঢেলে বাতি জ্বাললে নবিতুন। তারপর মাচাং থেকে কুলো নাবিয়ে তেনায় বাঁধা চালগুলো ছড়িয়ে রাখলো কুলোর ওপর। বার দুই আঙ্গুলে কুলোয় চটাক চটাক শব্দ তুলে ঝেড়ে নিল চালগুলো। আবার ছড়িয়ে দিল। ছড়িয়ে দিয়ে বাছতে লাগলো। বাছতে বাছতেই আক্‌কির দিকে একবার তাকাল নবিতুন। আক্‌কি কি কোন খবর পায়নি? না, আক্‌কির মুখে তেমন কোন আভাস নেই।

আক্‌কি তাজ্জব। সন্ধ্যা থেকেই মায়ের কাণ্ডমাণ্ড কিছুই বুঝছে না ও। নবিতুনের বারা বান্দার কাজটা যাওয়ার পর থেকে চেরাগ জ্বলে না ঘরে। ঠেকা বেঠেকায় দরকার পড়তে পারে বলে ছোট বৌর কাছ থেকে একটু কেরোসিন চেয়ে এনেছিল নবিতুন। সেই ঠেকার তেল দিয়ে হঠাৎ চেরাগ জ্বালিয়ে আজ চাল বাছবার কি দরকার পড়ল, বোঝে না আক্‌কি।

বাছা শেষ হলে চালগুলো ঘটিতে তুলে রাখল নবিতুন। কয়েকটা চাল কুলোর বেতের ফাঁকে আটকে রয়েছে। নখ দিয়ে খুঁটে খুঁটে সে চাল কয়টাও বের করল। দুটো তিনটে চাল পড়ে গেছে মাটিতে। একটি একটি করে সে চালগুলোও ঘটিতে তুলে নিল। তারপর যাতে ইঁদুর ঢুকতে না পারে সেজন্য ঘটির মুখে তেনা গুঁজে ঘটিটাকে তুলে রাখল কারের উপর। আয় আক্‌কি খেয়ে নি।

আক্‌কির মনে হল, আজ বড় নরম মায়ের ডাকটা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মায়ে ঝিয়ে বসল সানকিটার দুপাশে। দুপাশ থেকে হাত চালিয়ে খেয়ে নিল ওরা।

খাওয়া শেষ করেও ঘুমোতে গেল না নবিতুন। চেরাগ হাতে লয়ে ঘুরঘুর করে ঘরময়। ফেলে রাখা কাজগুলো সব এসে দাঁড়ায় ওর চোখের সুমুখে। ভিটিটা লেপা হয়েছে সেই কবে। পুব পাশটায় ইঁদুর মাটি খেয়ে খেয়ে এক সারি খোরল বানিয়েছে। কতদিন ভেবেছে নবিতুন মাটি এনে গর্তগুলোয় গুঁজে দেবে, ভাল করে লেপে দেবে জায়গাটা। কিন্তু ভাবাই সার! দিনে দিনে ইঁদুরের গর্তের সংখ্যা বেড়েই চলেছে।

ঘরে একটি মাত্র ছিকা। একটি দড়ি তার নরম হয়ে পড়েছে। ছিঁড়ে পড়তে পারে যে কোনদিন। মেরামত করবে বলে বড় হিশ্যা থেকে দু'-আশ পাটও চেয়ে এনেছে! সেও তো কতদিন হয়ে গেল। ছিকাটা এখনো মেরামত হয়নি।

ইস্, এতসব আগোছাল কাণ্ড দেখে কী ভাববে সারেং? ভাববে সারেংয়ের ঘর সংসারের দিকে একটুও মন দেয়নি নবিতুন। মনে মনে এসব ভাবছে নবিতুন আর কানটাকে সজাগ রেখেছে বাইরের অন্ধকারটির দিকে। এখুনি বুঝি শুনতে পাবে দুটো পায়ের শব্দ, একটি গলার আওয়াজ।

মা চেরাগটা নিভিয়ে দাও, তেল ফুরিয়ে যাবে যে।

আক্‌কির গলা পেয়ে হঠাৎ যেন হুঁস আসে নবিতুনের। ফুৎ করে চেরাগটা নিভিয়ে শুয়ে পড়ল ও।

শুয়ে শুয়েও কানটা খাড়া রাখে নবিতুন।

নিঝঝুম রাত। কোথাও একটু শব্দ নেই। হঠাৎ গাছের একটি পাতা ঝরে পড়ে হিস্যার টিনের চালে। ছ্যাঁৎ করে ওঠে নবিতুনের বুকটা।

উঠোন দিয়ে দৌড়ে যায় গ্রামের খেঁকি কুকুরটা। নবিতুনের মনে হয় কে যেন হেঁটে এল, থমকে দাঁড়াল ওর দোর গোড়ায়।

ছেলেটার পেসাব পেয়েছে। তাই বৌর ঘুম ভাংগাচ্ছে কোরবান—এই এই। নবিতুনের মনে হয় ও যেন শুনল ওর সেই পরিচিত গলার ডাক—বৌ বৌ। এক ঘড়ি। দু'ঘড়ি। রাতের প্রহরগুলো বুঝি কাবার হয়ে যায়। পাওয়া যায় না দুটো শব্দ। কানে বাজে না সারেংয়ের ডাক।

অন্ধকারের চাপে চোখের পাতাগুলো বুজে আসে নবিতুনের। তন্দ্রা নামে দেহ ঘিরে! বেড়ার ফুটো দিয়ে নবিতুন যেন দেখল, এসেছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওর সারেং। দেখল কত রং বেরংয়ের জিনিস সারেংয়ের হাতে। শাড়ী জামা চিরুণী চুলের কাঁটা খোঁপার ফুল—সবই নবিতুনের জন্য। আর কত কত সুন্দর 'বস্তু' আক্‌কির জন্য।

নবিতুন বুঝি দেখল, বড় কাহিল সারেংয়ের মুখখানি। কেমন শীর্ণ সেই শালতি শালতি বাহুজোড়া। আহা, তা হবে না? কত সাগর সাঁতরে এসেছে, কত দেশের কত পথ পাড়ি দিয়ে এসেছে সারেং তাই তো অমন কাহিল, অমন ক্লান্ত চেহারা। হঠাৎ নবিতুন যেন শুনলো সারেং ডাকছে ওকে—বৌ বৌ, দরজা খোল। ধড়ফড়িয়ে উঠে বসল নবিতুন। ছুটে গেল দরজার দিকে...

না। কোথাও কিছু নেই। উঠোনময় ঘন আঁধারের জাঁকাল রাজত্ব। চারিদিকে নিস্তব্ধ। শুধু কয়েকটা ঝিঁ ঝিঁ পোকা অন্ধকারের পায়ে কিসের জন্য যেন মাথা কুটে কুটে একটানা কেঁদে চলেছে। দরজাটা বন্ধ করে ফিরে এল নবিতুন। শুয়ে পড়ল আবার।

অকস্মাৎ মনে হয় নবিতুনের, বৃথা—বৃথা এই প্রতীক্ষা। নাবিক ওর হারিয়ে গেছে কোন দূর সাগরের উর্মিতলে। সে আর ফিরে আসবে না। গুজাবুড়ির কথাটা বুঝি খেটে গেল। সেই পঁচরা মুখ, কুটনী মাগী গুজাবুড়ি, তার কথাটাই বুঝি ঠিক। বুকের উপর হাত রাখল নবিতুন। সেই যে সকাল বেলায় আশা দিয়ে ভরিয়ে নিয়েছিল বুকটা এবং বিশ্বাস করিয়েছিল মনকে, সেই আশা আর সেই অসম্ভবের বিশ্বাস-টাকে এখন খুঁজে পায় না নবিতুন। বুকে এখন খাঁ খাঁ এক শূন্যতা। হু হু কান্না এসে ভরে দেয় সেই শূন্যতা।

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে নবিতুন।

বালিশটাকে আঁকড়ে ধরে নবিতুন।

বালিশটা ভিজে যায় নবিতুনের চোখের জলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৭

সেই বরই গাছটি। গাছটির দিকে চেয়ে থাকে নবিতুন।

গাছটির দিকে চেয়ে চেয়ে নবিতুনের চোখ আসে ঝাপসা হয়ে। টন টন করে চোখজোড়া। তবু চেয়ে থাকে নবিতুন! বুঝি ওই বরই গাছটির কাঁটায় কাঁটায় আটক নবিতুনের যত দীর্ঘশ্বাস। বুঝি ওই বড়ই গাছটির রুক্ষ গায়ে জমাট বাঁধা ওর যত মনের বিলাপ।

বরই গাছটি এখন ন্যাড়া। প্রায় সব পাতাই মরে গেছে। এ ডালে সে ডালে দু একটি মরা পাতা, যেন বিগত দিনের কোন ব্যর্থ কান্না। একেবারে মগডালের দিকে নতুন পাতার প্রথম কুঁড়ির ক্ষীণ সবুজটি শাদা চোখে এখনো অপরিস্ফুট।

এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে সম্ভাবনার সেই অস্ফুট ইঙ্গিতটাকেই বুঝি দেখছে নবিতুন। প্রথম কুঁড়ির সেই ক্ষীণ সবুজ ফুঁড়ে আবার পাতা বের হবে। আবার বরই আসবে। বরই পাকবে। আর একটি বছর ঘুরে আসবে। কিন্তু...

এই 'কিন্তুর' কথাটা মনে হতেই তাড়াতাড়ি চোখ ঘুরিয়ে নিল নবিতুন। হাতের সামনে ঝোলান জালটার দিকে মন দিল। তাড়াতাড়ি সুতো টানল, ঘর ধরল। আর 'কিন্তু' টাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল অনেক দূরে।

চৌধুরী বাড়ীর কামের ফাঁকে ফাঁকে ঝাঁকিজাল বুনছে নবিতুন! মিজিদের ফরমায়েশী। ওদেরই সুতো। নবিতুনের মজুরী দু'টাকা। একখানি জাল শেষ হয়েছে। আর একখানির ঘাই অবধি পেঁছে গেছে নবিতুন। দু'চার দিনের মধ্যেই শেষ করার ইচ্ছে নবিতুনের।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই জালখানি শেষ হলেই নগদ চারটি টাকা জমবে নবিতুনের হাতে। সেই টাকা দিয়ে আক্কিকে নতুন একটা শাড়ী কিনে দেবে ও। যুগিদের বাড়ীতে গিয়ে একটি রংদার শাড়ীর নমুনাও দেখে এসেছে নবিতুন।

খুশিতে বুকটা ভরে যায় নবিতুনের। এ্যদ্দিন পর একখানা নতুন শাড়ীর মুখ দেখবে মেয়েটি। নিজের কথা ভাবে না নবিতুন। চৌধুরীদের বৌর পুরনো তেনা মতো শাড়ী দিয়ে গা ঢাকবার কাজটা চলে যায় ওর।

গুজাবুড়ি এল লাঠি ঠুকঠুকিয়ে। নবিতুনের দাওয়ায় লাঠিটা শুইয়ে দিল গুজাবুড়ি। লাঠির উপর পায়ের গোড়ালিটা চেপে আস্তে আস্তে বসে পড়ল। গুজিবুড়ির মরণ নেই। এত লোক মরে, কিন্তু গুজাবুড়ি মরে না। থুরথুরে হয়েও আজরাইলের চোখটাকে ফাঁকি দিয়ে চলেছে গুজাবুড়ি। নবিতুনের গলার বিষ, নয়ন জ্বালা, গায়ের জ্বালা, মূর্তি-মতী বিভীষিকা হয়ে এখনো বেঁচে রয়েছে গুজাবুড়ি। বারেক চোখ তুলেই জালের ঘরগুলোর উপর দ্বিগুণ মনোযোগ দেয় নবিতুন।

ডান হাতটা নবিতুনের দ্রুত ওঠে আর নামে। বাঁ হাতে ধরা জালের ঘাই। আঙ্গুলের আগায় আগায় প্যাঁচিয়ে চলে সুতো। ঘরে ঘরে ঘুরে চলে সুতোর গোঁজটা। সুতোয় সুতোয় গিঁট পড়ে। তৈরী হয়ে যায় শক্ত শক্ত সুতোর ঘর, যেখানে ধরা পড়ে যাবে পানির নীচের যত মাছ। হাজার লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে, হাজার আথালি পাথালি খেয়েও পথ পাবে না পালিয়ে যাবার।

ঝাঁকি জালের ঘাই বেঁধে চলেছে নবিতুন। একদৃষ্টিতে তাই দেখছে গুজাবুড়ি। অমন নীরব কেন গুজাবুড়ি ?

লুন্দর শেখের কুটনী মাগি, ব্যাভিচারের দূতি গুজাবুড়ি। নবিতুনের তেজের কাছে কি অবশেষে হার মানল গুজাবুড়ি ?

পান্হা আছে রে নবিতুন, পান্হা ? একমুঠ পান্হা খাওয়াবি ?

হাতের গতি স্তব্ধ হয়ে যায় নবিতুনের। গোঁজটাকে জালের গায়ে ঝুলিয়ে রেখে জালটাকে হাত থেকে ছেড়ে দেয় ও। জালটা ঝুলতে থাকে। নবিতুন অবাক হয়ে দেখছে সগির মা গুজাবুড়িকে।

এত এত বান্দী, এত এত ধনদৌলত লুন্দর শেখের। মস্তবড় বালা-খানা শেখবাড়ীর। নবিতুন হবে সে বালাখানার রাণী। নবিতুনের পায়ে গড়াগড়ি খাবে সোনা-চান্দি দাসী-বান্দী আর খোদ লুন্দর শেখ। এ সব না বলে আজ একমুঠো পান্হা চাইছে গুজাবুড়ি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও নবিতুন, দেনা একমুঠ পান্হা। শুধু করুণ নয়, কী এক আর্ত-নাদের ব্যাকুলতা গুজাবুড়ির যাঞ্ছায়।

স্তব্ধ নবিতুন এবার চমকে যায়। উপোসের সাথে নবিতুনের পরিচয়। সেই পরিচয় দিয়েই ও শুনতে পায় গুজাবুড়ির স্বরে ক্ষুধার ডাক।

চৌধুরীগিন্নীর কৃপণ হাতে মেপে মেপে দেয়া দুমালা ভাত। দুটি পেট ভরে না ওতে। তবু কোন কোন দিন ও থেকেই দু'এক মুঠ ভাত হাড়িভর্তি পানিতে রেখে দেয় নবিতুন। ভাতের চেয়েও বড় কথা, এক মুঠ ভাত রাতভর ভিজে যে এক হাড়ি আমনি হয়, ওতে নুন মিশিয়ে পোড়া মরিচ ডলে স্বাদ জাগে অপূর্ব। ওই এক হাড়ি আমনি গিলে মা-বেটির পেট যায় ভরে। ক্ষিধেটাকে অনায়াসেই দুপুর অবধি ঠেলে রাখা যায়। রাতদিন ভেবেছে নবিতুন কচুবাটা পুরে দেবে গুজাবুড়ির দুষ্ট মুখে। কিন্তু সেটা তো ভাবনা পর্যন্তই থেকে গেল। আজ কচুবাটার বদলে নিজের ভাগের পান্হাটাই তুলে দিল গুজাবুড়ির মুখে।

বাকী পান্হাটুকু বাসনে তুলে আক্কিকে ডাকল নবিতুন। আক্-কির সাড়া নেই। অনেকক্ষণ ধরেই ধারে কাছে দেখছে না আক্কিকে। বাসনটা রেখে ঘাটার দিকে এল নবিতুন।

ঘাটার পর ক্ষেত! ক্ষেতের পর সেই রাস্তার ধু ধু। অজান্তেই নবিতুনের চোখটা চলে যায় ধু ধু ঘেরা রাস্তার দিকে।

এমনি হয়। ওই ধু ধু ঘেরা পথ, কদম সারেংয়ের বাড়ী ফেরার পথ। তাই ঘাটায় এলেই নবিতুনের চোখ জোড়া পড়ে থাকে সে পথের দিকে। কাজের কথা, চৌধুরী বাড়ী যাবার তাগাদা, প্রায় শেষ করে আসা ঝাঁকি জালটার কথা, সব কাজের তাড়া কেমন করে যেন ভুলে যায় নবিতুন। দূর রাস্তায় রোদের ঝিকিমিকি আর ধু ধু অস্পষ্টতার মাঝেই যেন হারিয়ে যায় নবিতুন। সারেং বাড়ীর ঘাটা ঘেষে পালবাড়ী যাবার পায়ে-হাঁটা পথ। কিছু দূর গিয়েই পথটা ঢাকা পড়েছে পালদের আম কাঠালের বাগিচায়। বাগিচার দিকে যেন আক্কির গলা পাওয়া যাচ্ছে।

চেহারা সুরত যেমন বাপের মতো তেমনি স্বভাবেও বুঝি দিনে দিনে বাপের মতো উড়ুক্কু হয়ে চলেছে মেয়েটি। ওকে ঘরে রেখে যায় নবিতুন। কিন্তু নবিতুনের ছায়াটা মিলেয়ে যেতে না যেতেই পালবাড়ীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিকে ছুট দেয় আক্‌কি। সেখানে সখি জুটিয়ে নিয়েছে ও।

আজ কড়া হবে নবিতুন। শাসন করবে আক্‌কিকে। বড় হচ্ছে বিয়ের লায়েক হচ্ছে এ সব যেন খেয়ালই নেই মেয়ের। মনে মনে শক্ত হয়ে বাগিচার দিকে পা বাড়ায় নবিতুন।

আমের ডালপালা ভেঙ্গে ঘর বানিয়েছে ওরা। ঘরের সুমুখে লেপে মুছে সুন্দর করে উঠোন বানিয়েছে। উঠোনে মাটি গোলা আর রং মিশিয়ে নানা ছবি এঁকেছে ওরা। কোনটা সূর্য, কোনটা চাঁদ, কোনটা তারা।

উঠোনের এক পাশে মাটি তুলে তুলে উনুন বানাচ্ছে ওরা। সেখানে বুঝি 'জোলাভাতি' রান্না হবে ওদের।

মাঘমণ্ডলের ব্রত হয়েছিল পালবাড়িতে। তারই অনুকরণে আক্‌কি আর ওর সখিরা ছবি আঁকা উঠোনে খেলছে, নাচছে, গান করছে, ছড়া কাটছে। ওরা গান ধরেছে ঃ

কলই খেতে নাইকো ফুল
গৌরীর মাথায় দীগ্‌গল চুল।
দীগ্‌গল চুলে মারল বাড়ি
ফুল ফুটেছে সারি সারি।

আপন মনে গানে আর খেলায় মত্ত আক্‌কি আর ওর সখিদের দিকে চেয়ে থাকে নবিতুন। দুনিয়ার দুঃখ-বঞ্চনার তাপ এখনো স্পর্শ করেনি ওদের। তাই এমন করে ওরা গাছের ছায়ায় খেলতে পারে, মন খুলে গাইতে পারে, নাচতে পারে। ওদের দিকে তাকিয়ে আক্‌কিকে শাসন করার কথাটা মনে থাকে না নবিতুনের। বুঝি মাকে দেখে উঠে আসে আক্‌কি। এসে মায়ের আঁচল ধরে টানে। মেয়ের হাত ধরে আর একবার দূরের সেই ধুধুটার দিকে চোখ রেখে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে নবিতুন।

জোলাভাতি বাঁধতে আসব না? ভয়ে ভয়েই শুধায় আক্‌কি। পান্তা খেয়ে, আমি চৌধুরী বাড়ী গেলে, তারপর আসবি। মেয়ের মাতৃভীতির বহর দেখে মনে মনে বুঝি খুশি হয় নবিতুন।

মায়ের উদারতায় আক্‌কিও মাথা দুলিয়ে হাসে।

ঘরে এসে দেখল নবিতুন, খেয়ে দেয়ে আক্‌কির পান্তাটা পাহারা দিচ্ছে গুজাবুড়ি। গুজাবুড়ির চোখে নেই কুটনামির কুটিল নাচন। গুজাবুড়ির জিবে নেই প্রলোভনের ডাক। গুজাবুড়ির লোলচর্ম মুখে নেই গোপন হাসি। এ যেন এক তাজ্জব ব্যাপার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফুরুৎ ফুরুৎ পান্তার পানি টানছে আক্কি আর নবিতুন দেখছে গুজাবুড়িকে। ক্ষুন্নিবৃত্তির প্রশান্তি গুজাবুড়ির মুখে। এক মুঠো পান্তা খেয়েই এত তৃপ্তি গুজাবুড়ির ?

আল্লা তোর হায়ত দরাজ করুক, ইজ্জতে হুরমতে রাখুক। গুজাবুড়ির প্রার্থনায় কি আন্তরিকতার সুর ? তা নইলে সে সুর এমন স্পর্শ করে কেন নবিতুনকে ? নবিতুনের মনে পড়ল বাপজানের মৃত্যুর পর এমন অন্তর নিংড়ানো দরদে কেউ তো কোন দিন দোয়া মাংগেনি নবিতুনের জন্য ? আবারও তাজ্জব হয় নবিতুন। কেমন করে জানবে নবিতুন, নবিতুনের তেজ, নবিতুনের দেমাকটাই আশ্রয়চ্যুত করেছে গুজাবুড়িকে ? লুন্দর শেখ যদি না পায় তার মুখের গ্রাস তবে সগির মা গুজাবুড়ির অন্ন কোথায় ?

কিন্তু, সে সব কথা কিছুই বলল না গুজাবুড়ি। আর একবার আল্লার দরবারে নবিতুনের দীর্ঘ জীবনের প্রার্থনা জানিয়ে লাঠিটা হাতে তুলে নিল। ঠক্ ঠক্ শব্দ তুলে চলে গেল।

ব্যস্ত হয়ে উঠল নবিতুন। চৌধুরীবাড়ীর কামে যেতে আজও দেরী হয়ে গেল। সেই পান্তার হাড়ি আর বাসনগুলো ধুয়ে নিল। জালটা গুটিয়ে ঘরে রেখে এল। তারপর উঠোনে পা রাখল।

বুয়া গো, বাপজান তোমাকে ডাকে, ছেলে কোলে শরবতি এসে দাঁড়িয়েছে উঠোনে।

গেল সনে বিয়ে হয়েছে শরবতির। কোল ভরা ছেলে আর মুখ ভরা হাসি নিয়ে কদিন হল নাইয়োর এসেছে বাপের বাড়ী।

কেন রে ? বড় হিস্যার দিকে পা বাড়িয়ে শুধাল নবিতুন।

দু'পা সামনে গিয়েই আর এগোল না নবিতুন। দাঁড়িয়ে পড়ল। লুন্দর শেখ কেন বড় হিস্যার দাওয়ায় ?

এই মাত্র এসেছে, বলল শরবতি।

শরবতির বাপজানের সাথে গল্প করছে লুন্দর শেখ। মাঝে মাঝে তার আড়চোখের দৃষ্টি চকিতে ঘুরে যাচ্ছে নবিতুনের উঠোনটায়।

ওই বদমাইশটার সুমুখে আমি যাবনারে শরবতি। দরকার কি, তুই জিজ্ঞেস করে আসবি কাকুকে ? ঘোমটাটা মুখের উপর লম্বা করে টেনে দাওয়ায় ফিরে আসে নবিতুন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আক্‌কি, আক্‌কি। তোর মা কোথায় রে? পশ্চিমের হিস্যা থেকে ডাকছে শরবতির দাদু, কামিজ বুড়ো।

দাদুর ডাকটা শুনে বলল শরবতি, আক্‌কিকেই পাঠিয়ে দাও বুয়া। লুন্দর শেখের সুমুখ দিয়ে যেতে আমারও ইচ্ছে লয় না।

আক্‌কিকে পাঠিয়ে দিয়ে ঘোমটার ফাঁকে চেয়ে থাকে ওরা।

আয় মেয়ে, এদিকে আয়। তোর মা বুঝি এল না? লোন্দর শেখই আক্‌কিকে ডেকে নেয় কাছে। বলে আবার। তোর মা বান্দীগিরি করে চৌধুরীবাড়ী, আমরাই মরে যাই শরমে। কেন, কদমের রুজি নেই, না কি ওর আপন বলে কেউ নেই গ্রামে?

লুন্দর শেখের কথায় বুঝি সায় দেয় কামিজ বুড়ো। হতে পারে সারেংবাড়ী গরীবের বাড়ী। তা বলে সারেংবাড়ীর মেয়েরা বড় বাড়ী গিয়ে দাসী বান্দীর কাম নিয়েছে এমন লজ্জাস্কর ঘটনা কেউ শোনেনি কোন দিন।

সে কি আমি জানি না? সারেংবাড়ীর ছেলেরা হল রোজগেরে ছেলে। তাদের বৌরা কবে গেছে অন্যের বাড়ী কাম করতে? বুঝি নবিতুনকে শোনাবে বলেই স্বরটা বেশ উঁচিয়ে তোলে লুন্দর শেখ।

তোর মাকে দিয়ে আয় এগুলো, বলে আক্‌কির হাতে কিছু টাকা তুলে দেয় লুন্দর শেখ। তারপর উত্তরের হিস্যার দিকে সোজা চেয়ে বুঝি নবিতুনের উদ্দেশ্যই বলল আবার, ভাল মন্দে তোর মা না হয় খবর টবর দেয় না আমাদের। কিন্তু আমাদের যে খোঁজ খবর নিতেই হয়। কদম তো আর পর নয় আমাদের।

কুটনী বুড়ির দৌত্য ব্যর্থ গিয়েছে। তাই কি সরজমিনে নিজেই আসরে নাবল লুন্দর শেখ। লুন্দর শেখের লক্ষ নাকি অব্যর্থ। লুন্দর শেখের শিকার নাকি ফসকায় না কখনো। এই এক নবিতুনই বুঝি ব্যতিক্রম। তাই মৃগয়া ক্ষেত্রে স্বহস্তেই তূণ ধরেছে লুন্দর শেখ।

ছোঁ মেরে আক্‌কির হাত থেকে টাকাগুলো ছিনিয়ে নিল নবিতুন। দ্রুত পায়ে এসে দাঁড়াল লুন্দর শেখের মুখোমুখি। ঘোমটা তার খসে পড়েছে। কাঁধ ছেড়ে নীচের দিকে ঢলে পড়েছে আঁচলটা। লুন্দর শেখের লুব্ধ চোখ লেহন করে যায় সারেং বৌর রূপের সুধা। কিন্তু সেদিকে হুঁশ নেই নবিতুনের। লুন্দর শেখের উপর এসে পড়ল মোড়ানো কাগজের দলাগুলো। দুমড়ানো নোটগুলো ছড়িয়ে পড়ল এদিক ওদিক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখলে তো শরবতির বাপ। দেখলে তো কামিজ কাকু, দেখলে? দেখে রাখ মাগির তেজ। সাক্ষী রইলে তোমরা—টাকা দিলাম, টাকা নিল না মাগিটা। কদম এলে বলবে তোমরা। বলতে বলতে নোটের দলাগুলো কুড়িয়ে নিল লুন্দর শেখ।

তা এখন ওর কদমেরই বা দরকার কি, টাকারই বা কি ঠেকা? 'লাং' এর তো আর অভাব নেই, টাকারও কমতি নেই। বুঝলে শরবতির বাপ, কদম যতই দেরি করবে আসতে ততই ভাল! একেবারে না এলে আরো ভাল। চৌধুরীবাড়ীতে বান্দীগিরিতে বড় মধু গো, বড় মধু। আহা এমন মধু কী আর কদম দিতে পারে? বুঝলে শরবতির বাপ?

ক্যান ক্যানে গলায় কেমন টেনে টেনে বলে লুন্দর শেখ। কথাগুলোর মতোই কুৎসিত বিসদৃশ এক হাসি লুন্দর শেখের মুখে। কিন্তু চোখে তার কামনার বহ্নি। দেহময় কি এক আক্রোশে লোলুপতার তপ্ত প্রবাহ। বিস্রস্ত আঁচল নবিতুনের পুষ্ট বুকের ক্ষণ-উদ্ভাস লুন্দর শেখের রোঁয়ায় রোঁয়ায় আগুন ধরিয়ে গেছে।

আর কিছু বলার জন্য মুখ খুলেও থেমে গেল লুন্দর শেখ। কেন না নবিতুন তখন দরজাটা ভেজিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে উত্তরের গাছ গাছালির আড়ালে। আক্‌কি চলে গেছে চড়ুই ভাতির উৎসবে।

দেরি করে গেছে নবিতুন, অতএব ফিরতেও দেরি হয়ে গেল। পাকা হিসেবি গিন্নি চৌধুরীবিবি। সকালের দেরিটুকু পুষিয়ে নিয়েছে বিকালের দিকে।

উঁচু উঁচু গাছের আগায় গোধুলির শেষ আভাটুকুও মিলিয়ে গেছে। ঝোঁপাল গাছগুলোর পাতা সরিয়ে সরিয়ে পথ করে নিচ্ছে অন্ধকার। গরু আর ঘাস নিয়ে ক্ষেত থেকে যাদের ফেরার কথা সেই কিষাণের দল বুঝি নবিতুনের আগেই ঘরে ফিরেছে আজ।

রাস্তাটা নির্জন, মাথার উপর নীড়ফেরা পাখি কিচিমিচি ব্যস্ততা। খাবার সন্ধানের সময় হল বলে বাদুরগুলোর তাড়াহুড়া পাখা ঝাপটানী। এ ছাড়া কোন শব্দ নেই কোথাও।

ভাতের সানকিটা হাতের তালুতে উঁচিয়ে ধরে তাড়াতাড়ি পা ফেলছে নবিতুন। চৌধুরীবাড়ীর কাজ সেরে ফিরতে কখনো এত দেরী হয়নি ওর! অন্ধকারকে ভয় নবিতুনের। অন্ধকার রাতেই 'কুই' পড়ে ঘরের চার পাশে, ওঁত পেতে থাকে গ্রামের গুন্ডাসান্ডার দল। অন্ধকার রাতে তাই ঘর ছেড়ে এক পাও বের হয় না নবিতুন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাট ক্ষেতের আলে নেবে গা-টা কেমন ছমছম করে নবিতুনের। আল-টার দু'পাশে ঘন পাট চারা নবিতুনের মাথা ছাড়িয়েও হাত দু'হাত উঁচু সব পাটেরমাথা। পাটপাতার ঘন অন্ধকারের মাঝে আলের পথটা বড় আবছা। ভাতভর্তি সানকিটা ডান হাত থেকে বাঁ হাতের তালুতে এনে যথাসম্ভব জলদি জলদি আল ভাঙ্গে নবিতুন। কতটুকুই বা আলের পথ। আলটা পেরুলে আবার রাস্তা। কিছু দূরে এসেই থমকে দাঁড়াল নবি-তুন। পাতা ভর্তি পাটের মাথাগুলো নড়ছে। আলের কাছ ঘেঁসে খস খস একটা শব্দও। আবছা আঁধারে দৃষ্টিটাকে যতটা তীক্ষ্ণ করা যায় ততটা তীক্ষ্ণ করে দেখল নবিতুন। না, পাটের মাথাগুলো এখন স্থির। হয়তো কোনো উড়ো পাখির পাখার বাতাসে নড়ে উঠেছিল। আলটার উপর নজর রেখে আবার হাঁটা দেয় নবিতুন।

কিন্তু তিন কি চার কদম, তার বেশী হাঁটতে হল না নবিতুনকে। এবার একেবারে ওর পাশেই জোরে জোরে দুলে গেল পাটের ঘন-পাতা মাথাগুলো। পটাপট কাছের পাট গাছগুলো ভেংগে দুমরে কে যেন বেরিয়ে এল জানোয়ার অথবা মানুষ।

নবিতুন কোন কিছু ঠাওর পাবার আগেই জানোয়ার অথবা মানুষটা ঝাঁপিয়ে পড়ল নবিতুনের উপর। আলের উপর পড়ে দুখান হয়ে গেল ভাতের সানকিটা। ছিটিয়ে পড়ল ভাত তরকারি।

ভয় পেল নবিতুন। ভয়ে যেন স্তব্ধ হল, কাঠ হল। আত্মরক্ষার সহজাত তাগিদে হাত দুটো হয়তো উঠে আসতে চাইল উপরের দিকে। গলা ফুঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইল একটা চীৎকার।

কিন্তু আচানক ভয়টা বুঝি একেবারেই কাবু করে ফেলেছে ওকে। হিম হয়েছে ওর গায়ের রক্ত। হিম হয়ে জমে গেছে হাত পা। এমন কি গলার শব্দনালীর সরু পথটুকুও।

কোন প্রয়োজন নেই, তবুও জানোয়ারটা অথবা মানুষটা তার হাতের থাবা চেপে রাখল নবিতুনের মুখের উপর। বিশাল ভারি আর শক্ত দুটো বাহুর চাপে যেন ভেংগে ফেলল নবিতুনের হাতের হাড়, বুকের হাড়। শ্বাস বুঝি রুদ্ধ হয়ে আসছে নবিতুনের।

এবার মানুষ অথবা জানোয়ারের হাতটা একটু আগলা হল। সে হাত গামছা প্যাচিয়ে শক্ত করে বেঁধে ফেলল নবিতুনের মুখটা। যতখুশি গলা ফাটিয়ে মরুক নবিতুন, শব্দ আর বেরুচ্ছে না ওর মুখ দিয়ে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু সেই মানুষ অথবা জানোয়ারটা, এতক্ষণে সেও যেন ভয় পেল। কোন কারণ নেই তবু যেন ভয় পেয়েছে। এতটুকু প্রতিরোধ এল না নবিতুনের কাছ থেকে, ধস্তাধস্তি পাছড়াপাছড়ি কিছুই হল না। তবু সে যেন একটু ক্লান্তও।

তাই হাতের বেষ্টনী শিথিল করে সে যেন হাঁপিয়ে নিল কয়েক সেকেন্ড। মানুষ অথবা জানোয়ারটা এবার নবিতুনের বাঁধা মুখখানিকে বুকের উপর জাপটে ধরল। জাপটে ছেঁচরাতে ছেঁচরাতে নিয়ে গেল পাট ক্ষেতের জঙ্গলে।

জঙ্গলে নিয়ে নবিতুনের শায়িত দেহের উপর চেপে বসল জানোয়ারটা। আচানক ভয় পেয়েছিল নবিতুন। ভয়ে স্তব্ধ হয়ে ছিল, কাঠ হয়ে ছিল। তেমনি আচানক হুঁশটাও পেয়ে গেল নবিতুন। হুঁস পেয়ে শরীরের শক্তিটাকেও যেন ফিরে পেল নবিতুন।

পাটের ক্ষেতে ঘন অন্ধকার।

অন্ধকারেই চোখ মেলল নবিতুন। অন্ধকারেই দেখল জানোয়ার নয় মানুষ, মানুষ বেশে এক জানোয়ার। জানোয়ারটাকে মুহূর্তে চিনে নিল নবিতুন। সেই জানোয়ারটার পায়ের চাপে আটক নবিতুনের পা। সেই জানোয়ারটার দেহের চাপে আর কব্জির শক্ত বাঁধনে বন্দী নবিতুনের দেহ, নবিতুনের দুখানি হাত। একটু হেলতে পারছে না, একটু নড়তে পারছে না নবিতুন। সেই জানোয়ারটার আঙ্গুলের সুড়সুড়ি জাগে নবিতুনের নাভির কাছটিতে। তারপর ধীরে ধীরে নাভির নীচে। কুটিল সরীসৃপের। মতো গুটি গুটি হেঁটে যায় জানোয়ারের আঙ্গুল।

জানোয়ারটার নিঃশ্বাসে যেন আগুন। পশুত্বের বন্যতার বর্বরতার হিংস্র এক আগুন। সে আগুনে বুঝি ঝলসে যায় নবিতুনের গলা, চিবুক আর মুখটা। কিন্তু সে আগুন আর এক আগুন ধরিয়ে দিল সারেংবৌ নবিতুনের রক্তে। স্যাঁত স্যাঁতে পাটক্ষেতের জংলী অন্ধকারেও বুঝি আগুন ধরে গেল।

নবিতুনের ডান হাতখানি কেমন করে যেন আলগা হয়ে গেল। খাপ থেকে যেমন করে বেরিয়ে আসে তলোয়ার তেমনি সরাক করে মাটি থেকে উঠে লক্ষ্যের দিকে ছুটে গেল নবিতুনের ডান হাতখানি। সে হাত ধরে ফেলল জানোয়ারটার অণ্ডকোষ।

প্রাণপণে দাঁতে দাঁত ঘঁসে শক্তি টানল নবিতুন। সমস্ত শক্তি ওর জড়ো হল, দৃঢ় হল পাঁচটি আঙ্গুলে, একটি মুঠিতে। টিপে ধরল, চেপে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধরল নবিতুন। শক্ত করে, আরো শক্ত। আরো জোরে। প্রাণপণে।

মানুষবেশী পশুটা অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফটিয়ে বসে পড়ল। ছিটকে পালাতে চাইল! পারল না। কাতরিয়ে গোংগিয়ে নবিতুনের শরীরটাকে প্রথমে পা, পরে হাত দিয়ে পাড়িয়ে দুমড়িয়ে কোন রকমে উঠে দাঁড়াল সে। কিন্তু ঝুলে রয়েছে নবিতুন। একহাতের টানে কত শক্তি নবিতুনের! যেন ছিঁড়ে ফেলবে, ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে বাতাসে ছিঁটিয়ে দেবে ওই মানুষটির বর্বর পশুত্বটাকে। পশুত্বের চিহ্নটাকে উপরে ফেলবে ওর দেহ থেকে।

তীক্ষ্ন তীব্র যন্ত্রণায় চীৎকার করে উঠল মানুষবেশী জানোয়ারটা। স্যাঁতস্যাঁতে পাট ক্ষেতের জংলী অন্ধকার চিরে লোকালয়ের দিকে ছুটে গেল সে চীৎকার! সেই চীৎকারটার পিছু পিছু লুন্দর শেখও দৌড়ে চলে গেল পাটক্ষেতের অন্ধকার থেকে।

নারী অনুপমা। কেন না লজ্জা তার ভূষণ। তাই নিষ্ঠুর উলংগ মৃত্যুর মুহূর্তেও আপন আব্রু আর লজ্জা সম্পর্কে বড় সচেতন।

সেই জানোয়ারটা খুলে ফেলেছিল নবিতুনের শাড়ী। ওটা পড়ে আছে হাত দুই দূরে। বাঁ হাতে শাড়ীখানা তুলে নিল নবিতুন। পট পট পাটের গাছ ভাংতে ভাংতে বেরিয়ে এল সেই আলের পথে। আলের পথ ধরে ছুটে চলল। উঠে এল রাস্তায়। রাস্তা ছেড়ে ডাংগায়।

সেই জানোয়ারটা বুঝি এখনো ধাওয়া করে চলেছে নবিতুনকে। অন্ধকার যেন তারই অজস্র বাহু। পাশবিকতার সেই অজস্র বাহু যেন এখুনি আবার ধরে ফেলবে নবিতুনকে। গলা টিপে শ্বাসরুদ্ধ করে মেরে ফেলবে। তাই বেহুশ উন্মাদিনীর মতো ছুটছে নবিতুন।

আঁধারে চেনা যায় না পথ। কাঁটা ফোটে পায়ে। রক্ত ঝরে। উঁচুনিচু মাটিতে ঠোক্কর খেয়ে বসে পড়ে নবিতুন। গাছের গুঁড়িতে বাড়ি খেয়ে ছিটকে পড়ে শরীরটা। তবু কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই নবিতুনের। ও ছুটছে বাড়ীর দিকে।

এই টুকু তো পথ। তবু নবিতুনের মনে হয় সেই কখন থেকে ছুটছে ও। ছুটতে ছুটতে এক সময় ও পৌঁছে গেল বরই গাছের সীমানা দেয়া উঠোনে।

আক্‌কি, আক্‌কি, ক্লান্ত দুটি স্বর যেন বহু দূর থেকে ডাকল। তারপর দোরগোড়ায় মূর্ছা খেয়ে পড়ে গেল নবিতুন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৮

আবার পানি কাটা, ঢেউ ভাংগা। দীর্ঘ একটানা পাড়ি।

সমুদ্রের হু হু হাওয়া আর ঢেউয়ের দোলায় বুঝি কেটে যায় বন্দরের ঘোর। আবার ওরা সাগরের নাবিক, ভাসমান তরীর নির্ভীক কান্ডারী। ধীর শান্ত স্থির।

ঘুম ভেংগেই বিছান থেকে লাফিয়ে পড়ল কদম। খুলে দিল কেবিনের জানালা। খোলা বুকটাকে মেলে ধরল বাতাসের ঝাপটার মুখে। যতদূর যেতে পারে ততদূর ছেড়ে দিল চোখ দুটোকে।

ঊষার এই সমুদ্র আর আকাশ, বিচিত্র তার শোভা। সেই চৌদ্দ বছর বয়স থেকে গেল পনেরটি বছর দেখে আসছে কদম। তবু যেন পুরনো হয় না। চোখটা লেগে থাকে, উঠে আসতে চায় না।

সকাল দুপুর বিকেল-নানা আকাশ, নানান মেঘ আর নোনা পানির রং এ সব নিয়ে কখনো মাথা ঘামায় না কদম। কদম যেন বুঝেও না এ সব, এত রং এত রূপের কৌতুক। লালচে পানি, ধলা পানি, পোড়া মাটি-রং এত পানি—থৈ থৈ নীলটার দিনে রাতে এতবার পোশাক বদল, —বুঝি মাথা গুলিয়ে যায় কদমের। তাল গোল পাকিয়ে যায় আকাশের লীলা দেখে—থৈ থৈ নীল বদলাবে তার পোশাক আর তারই সাথে পাল্লা দিয়ে আকাশ বদলাবে তার রং। লাল রং গোলাপী রং সীসা রং, ধলবরণ কুঁচবরণ—কত যে রংয়ের পাখনা, বাহারি রং আকাশটার। সত্যি মাথা গুলিয়ে যায় কদমের। তবু কী কেরামতি এই সমুদ্রের! সমুদ্রে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এসেই কদমের চোখজোড়া আপনা আপনিই চলে যায় বিশাল বেশুমার ওই বিস্তৃতির রাজ্যে। যেখানে আকাশ আর পানির বিচিত্র লীলা, ক্ষণে ক্ষণে রং বদল ঢং বদল বেশ বদল।

আজো এই ভোরের লগ্নে আসমান আর সাগরের রংয়ের খেলায় চোখ জোড়া ডুবে থাকে কদমের। চোখ দুটো উঠে আসতে চায় না।

পুবের দিকটা যেখানে আকাশটা নেবে এসে বুক দিয়েছে সমুদ্রকে যেখানে এখন প্রথম সূর্যের অরুণরাগ। সমুদ্রের বুক ফুড়ে উঠে আসছে সূর্যটা আর আকাশ তাকে বাড়িয়ে দিয়েছে সম্ভাষণের হাত। এ যেন কোন মহাজন্মের কোন মহাজাগরণের আনন্দ-লগ্ন। তাই আকাশ চঞ্চল। বাতাস উদ্দাম। সাগর উজ্জ্বল।

তরংগে তরংগে বুঝি ছড়িয়ে পড়েছে সে মহাজন্মের বারতা। আকাশের বিচিত্র বর্ণচ্ছটা দিকদিগন্তে উড়ে চলেছে এ জাগরণের শুভ ঘোষণায়। আর উদ্দাম বাতাসটা লক্ষ আনন্দের ঢেউ হয়ে ছুটে চলেছে লোকালয়ে, অরুণ গহীনে, ঘুমন্ত পৃথিবীতে, সেখানে পৌঁছে দেবে আনন্দ জাগরণের প্রথম খবর।

ভোরের সমুদ্র গম্ভীর নয়। মৌণ নয়।
ভোরের সমুদ্র ভয়ংকর নয়। হিংস্র নয়।

ভোরের সমুদ্র যেন একটি মেয়ে, যে পেয়েছে জীবনে মধুরতম অভিজ্ঞতার প্রথম স্বাদ। আনন্দের পাত্র তার ভরে গেছে কানায় কানায়, অঙ্গে অঙ্গে তার মধুরতার মৃদুল ছন্দ। লক্ষ আনন্দে উপচে পড়তে চায় মেয়েটি, ভুবনময় জানিয়ে দিতে চায় ওর এই আনন্দবারতা। কিন্তু প্রথম অভিজ্ঞাতার সেই মধুর শিহরণ, মনে পড়তেই লজ্জায় রাংগিয়ে যায় মেয়েটি। সলাজ কমনীয়তায় মনোরম হয়ে আপনার মাঝেই ভেঙ্গে পড়ে, ঝরে পড়ে। ভোরের সমুদ্র যেন সেই মেয়ে।

এখন জাগরণের লগ্নে আনন্দ বিভোর সমুদ্র। ভোরের সমুদ্র লাল তরল সোনার তরঙ্গ খেলা। আকাশের সাথে তার কোলাকুলি বাতাসের সাথে কত চুমোচুমি।

আসমান আর সাগরের এখন একই রং। এটা বুঝি জন্মলগ্নের রং। গাঢ় তরল লাল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সোনালী থালার মতো সূর্য। ধীরে ধীরে সাগরের কোল ছেড়ে উঠে আসছে আকাশের আলিঙ্গনে। চারিপাশে তার সোনালী বেশে মেঘের কুর্নিশ।

সূর্যেরই মতো উজ্জ্বল রঙ্গিন হাসিতে হেসে উঠল আকাশ আর সমুদ্র। দূর পৃথিবীর মানুষ এতক্ষণে টের পেল ভোর হয়েছে।

আর এখানে জাগরণের লগ্ন বুঝি শেষ। সূর্যের এখন অনেক তাড়া। সুপ্তিভঙ্গের আলসেমিটা কাটিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলছে সূর্য। লক্ষ্য তার উর্ধ্বলোক। বদলে যাচ্ছে সমুদ্র আর আকাশের রং। গাঢ় সোনালী হয়ে এল ফিকে লাল। ফিকে লাল ধীরে ধীরে হাল্কা গোলাপী। ফিকে লাল হাল্কা গোলাপী আর নীলের মিশেলে বিচিত্র রঞ্জন আকাশের গায়ে। সেই রঞ্জিত আকাশের প্রতিবিম্ব নীচের নীলাম্বু আরশীতে!

আর এই মুহূর্তেই, আকাশ আর সমুদ্র পরস্পরের আলিঙ্গন থেকে যেন ছিটকে পড়ল। ছিটকে পড়ল অনেক দূরে। পূবের সীমানায় রক্তরাখীতে গড়ে উঠেছিল যে মিতালী সে রাখীর সুতোটা যেন আচমকাই ছিঁড়ে গেল। তাই এখন ওরা কেউ আর কারো খবর রাখছে না। মেঘের পেখম মেলে আকাশ নাচছে সূর্যকে ঘিরে। আর সমুদ্র চলেছে আপন মনে, উচ্ছল ছলছল কল কল অনাদি কোন গানের সুরে।

হঠাৎ বেজে উঠল ঘন্টা। বিপদের ঘন্টা। চোখের নিমেষে কেবিন ছেড়ে ছুটে গেল কদম।

আগুন লেগেছে জাহাজের সেকেণ্ড হোল্ডে। বলকে বলকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। বাতাস এসে উসকিয়ে দিচ্ছে আগুনটা। এখনি বুঝি সর্বনাশা আগুন ছড়িয়ে পড়বে সারা জাহাজে।

চারিদিকে মহাসাগরের অথৈ পানি। তারই মাঝে আগুন লেগে গেছে রুতুন্দা জাহাজে। পারের মানুষের কাছে এটা একটি খবর। তার বেশী নয়। কিন্তু রুতুন্দা জাহাজের নাবিক, ওদের কাছে এটা জীবন মরণের লড়াই। হয় আগুন নিভবে, অক্ষত থাকবে জাহাজের শরীর, কলকব্জা। নতুবা সর্বনাশা আগুন গ্রাস করে নেবে গোটা জাহাজটাকে। লিকলিকে শিখাগুলো খোলের উপর জুড়ে দেবে প্রমত্ত নাচন। দেখতে দেখতে ছাই হবে কোটি টাকার পণ্য। দগ্ধ খোলের গায়ে জাগবে ফুটো, ফেটে যাবে খোলটা। পানি ঢুকবে গলগলিয়ে। সওদাগরী জাহাজ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রুতুন্দা ধীরে ধীরে তলিয়ে যাবে আটলান্টিকের অতলে। তখন ক্লান্ত ব্যর্থ নাবিকের দল প্রাণটা হাতে লয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে অথৈ-পানি মহাসাগরের অজানায়। রুতুন্দা তরীর কাণ্ডারী, ওরা হুঁশিয়ার। ঝড় ঝঞ্ঝায় ওরা অবিচল। দুর্যোগের মুখে দুঃসাহসী। সবাই মিলে ওরা আগুনটাকেই ঘিরে ধরেছে। সক্রিয় হয়েছে পাম্পগুলো। হাতে হাতে পাইপের মুখগুলো নিবদ্ধ আগুনের দিকে। অগ্নিনির্বাপী শত সহস্র তীরের মতো পানির ধারা ছুটে পড়ছে আগুনের ওপর। কিছুক্ষণের ভেতর আয়ত্ত হয়ে গেল আগুনটা। অক্ষত রইল জাহাজ। পুড়ে গেছে কিছু পণ্য। তা নিয়ে মাথা ঘামায় না নাবিকের দল। ওদের মায়া জাহাজের জন্য।

বুঝি সফল সংগ্রামের কৃতি অধিনায়ক কাপ্তান হিক্‌স। তাই আনন্দে ডেকের ওপরই ধেই ধেই নাচ শুরু করে দিয়েছে হিক্‌স। হাতে হাতে বিলিয়ে দিয়েছে বোতল। খুলে দিয়েছে রসদের ঘর। আজকের জন্য কোন কিছুতেই মানা নেই, নিষেধ নেই।

কদমের চোখে বুঝি ঘোর ধাঁধা হিক্‌স সাহেব। বৌর অসুখ সংবাদে কেঁদে বুক ভাসায় হিক্‌স। আরোগ্য খবরে রাস্তার মাঝে নাচে, ফুর্তি করে, বন্দরের মেয়েকে নিয়ে শুতে যায় কেবিনে। সামান্যতেই রেগে যায় হিক্‌স, মুখ খারাপ করে, গালির চোটে তুলে নেয় কালা আদমির গায়ের চামড়া। কিন্তু আনন্দের মুহূর্তে সে যেন পৃথিবীর সম্রাট, গোটা পৃথিবীটাই বিলিয়ে দেবে আপন নাবিক সাথীদের। হিক্‌ সাহেবের মতো অমন দিল খুলে খুশ বানাতে আর কাউকে কখনো দেখেনি কদম। এ বুঝি সাদা চামড়ার ধর্ম, ভাবে কদম। হাতে হাতে বোতল ঘুরে চলেছে, আর ঘুরে চলেছে শুকনো মাংসের প্যাকেটগুলো। মৃত্যুকে হঠিয়ে দিয়েছে ওরা। মৃত্যুর গহ্বর থেকে ছিনিয়ে এনেছে প্রাণ। তাই প্রাণ বয়ে ওদের ফুর্তি বান।

মাংসের শুটকি দিয়ে পেটটাকে ঠেসে নেয় কদম। তারপর আলগোছে আনন্দের ভীড়টা ছেড়ে উঠে আসে নিজের কেবিনের পাশে খোলা ডেকটায়। সকালের সেই লাল সূর্যটা এখন মাথার উপর। মাথার উপর সাদা আগুনের গোলাকার পিণ্ড হয়ে অবিশ্রাম জ্বলে চলেছে।

আর সেই আকাশটা, আরো দূরে সরে গেছে। দূরে গিয়ে দিব্যি বসে আছে মসজিদের মাথায় প্রকান্ড গম্বুজটির মতো। সকাল বেলাকার সাগরের সঙ্গে এত যে মাখামাখি কোলাকুলি, সে সব কথা যেন মনেই নেই তার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিচে সমুদ্রের পানিটা এখন ঘন নীল। ঘন নীলের বুকে রুপালী রোদের ঝিকিমিকি খেলা। ঢেউয়ের পিঠে পিঠে নীলে শুভ্রতার ঝিলমিলি নক্সা। অমন যে রোদ, সাগর পানির ছোঁয়া পেলে কেমন নরম হয়ে গলে যায়। গিয়ে যায়। সেকেণ্ড হোল্ডের সেই আগুনের আঁচ লেগে চোখ মুখটা কেমন তেঁতে গেছিল কদমের। মহাসাগরের নীল মেখে স্নিগ্ধ হল, ঠাণ্ডা হল ওর চোখ জোড়া।

লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে ছুটে ছুটে আসছে ঢেউ। ঢেউ-ঢেউ ঠোকাঠুকি কোলাকুলি। অবাক হয়ে ভাবে কদম, কতদূর থেকে আসে ঢেউগুলো ? বুঝি অনেক দূর থেকে ! অনেক দূরে সহস্র ঢেউ মিলে তৈরী হয় একটি বিরাট ঢেউ। সেই ঢেউটা কী আক্রোশে,কী এক গর্জনে ক্রুদ্ধ সাপের মতো ফণা উঁচিয়ে তেড়ে আসে। ওই যে আসছে। একটার পেছনে আর একটা। কদম গুণে চলে, দুটো তিনটে পাঁচটা আরো...আরো... আর গোনা হয় না। কাছের ঢেউটা একেবারে চোখের সুমুখে এসে পড়েছে।

কাছে আসতে আসতে যেন আরো বিশাল হয়, আরো ফুলে ওঠে ঢেউটা। উঁচু হয় পর্বতের মতো। মনে হয় অমন একটি ঢেউয়ের আঘাতে গুঁড়িয়ে যাবে জাহাজটা। জাহাজটাকে চুরমার করে দিয়ে, জাহাজটার উপর দিয়েই চলে যাবে ঢেউয়ের পর্বত। কিন্তু, কী আশ্চর্য ! জাহাজটার কাছে এসেই যেন পরম বাধ্যতায় গাটা ছেড়ে দেয়, মাথাটা নীচু করে নেয় ঢেউ। অতি অবজ্ঞায় বিশাল সেই পানির পাহাড়টাকে পাশে সরিয়ে দিয়ে এগিয়ে যায় রুতুন্দা জাহাজ।

সাগরের বুঝি এক লহমার বিশ্রাম নেই, শান্তি নেই, স্বস্তি নেই। কী এক বিক্ষোভে, কী এক বেদনায় যেন আপনার মাঝে আপনিই নিরন্তর মাথা কুটে মরে সমুদ্রটা। আপনার মাঝেই গর্জে গুমড়ে ফুলে ফুলে একাকার হয়। তরংগে তরংগে বুঝি সেই অস্থিরতারই প্রকাশ, ক্ষুব্ধ সেই বেদনারই কান্না। এই বিক্ষোভ এই অস্থিরতা, এ বুঝি অনন্ত যুগের, মহাকালের। এ বেদনার কোন শেষ নেই।

কদম এ সব কথা ভাবে না। ও ভাবে, ওই সাগরের সাথে তার গড়ে উঠেছে কী এক আত্মীয়তা, কী এক মমতার বন্ধন। হাজার চেষ্টা করেও এ বন্ধন বুঝি কোন দিন ছিঁড়তে পারবে না কদম। সাগরটা যেন ওর আপন। যেমন আপন নবিতুন। যেমন আপন আক্কি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নবিতুন বলত, ওই শরবতির বাপ, ওই কোরবান, জাহাজের কাজ ছেড়ে জমি কিনেছে ওরা। তুমি কিনছ না এক কানি জমি।

নবিতুনের কথাটাকে আমল দিত না কদম। জমির কথাটা নিরুত্তরে যাওয়ায় নিজের কথা বলত নবিতুন, মানুষটাকে বিদেশ পাঠিয়ে কোন বৌ শান্তি পায় ? জিন্দেগীটাই কি এমনি বিদেশ করে কাটাবে সারেং ? তবু চুপ থাকত কদম। ওর নীরবতায় বুঝি উৎসাহ পেত নবিতুন। বলে চলত নবিতুন, ক্ষেতখামার গেরস্তের লক্ষ্মী। ক্ষেতি নেই খোন্দ নেই, সে কেমন গেরস্ত গো ?

এবার উত্তর না দিয়ে থাকতে পারত না কদম। বলত, আমি যা রোজগার করে আনি গেরস্তিতে যে তার অর্ধেকও পাবি না নবিতুন। তখখুনি জবাব দিত নবিতুন। থাক রোজগার। গেরস্তি কর। গেরস্তিতে আয়। গেরস্তিতে লক্ষ্মী।

কিন্তু নবিতুনের কথায় কোন দিনই সায় দেয়নি কদমের মনটা। ছুটির দিনগুলো শেষের দিকে কেমন একঘেয়ে আর ক্লান্তিকর মনে হত কদমের। হাঁসফাঁস করত কদম। মনে হত সমুদ্র যেন ডাকছে ওকে। সাড়া দিয়ে সমুদ্রের কোলে ফিরে আসার জন্য কেমন অস্থির হয়ে উঠত কদম।

ফিরবার দিনটা যতই ঘনিয়ে আসত ততই বেড়ে যেত সেই অস্থিরতাটা। আর বেড়ে যেত নবিতুনের আবদার, অনুযোগ, চোখের পানি। লতার মতো কদমের গলার সাথে ঝুলে থাকত নবিতুন, কিছু বলতে পারত না। বলার মত কথা সবই চোখের পানি হয়ে ঝরে পড়ত।

আপন বুকের উপর ধরে রাখা নবিতুনের বুক। সে বুকের ধুক ধুক পিটুনি, কান্নার শব্দ সবটাই শুনতে পেত কদম ! কিন্তু মন যে তার চলে গেছে মহাসাগরের নীলে। নবিতুনের বাহু জোড়া আস্তে ছাড়িয়ে আলগা হত কদম। বিদায় নিত।

দেশে মাটির আশ্রয়ে নবিতুনের উষ্ণতায় কয়েকটা দিন কাটতে না কাটতেই কদমের কানে বাজে সমুদ্রের গান। আর এই সমুদ্রের পানি কেটে চলতে গিয়ে কেবলই মনে পড়ে ডাংগার সেই শক্ত মাটির কথা, দেশের কথা, ঘরের কথা, বৌ নবিতুনের কথা, ইচ্ছে করে কদমের উড়ে যায় বামনছারি গ্রামের সারেং বাড়ীর সেই উত্তরের হিস্যায়। কেন এমন মনে হয় ? এ রহস্যের কোন কিনারা পায় না কদম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ যেন একই স্রোতের দুমুখী টান। যখন ও নবিতুনের বুকে তখন সমুদ্রের পিছুটান। আর যখন ও সাগরের কোলে তখন দেশের ডাক, নবিতুনের টান! এ বড় রহস্য। এই একই স্রোতের দুমুখী টানের কোন মীমাংসা আছে কি? এমনি সব কথা ভাবতে ভাবতে কখন বিছানায় গিয়ে গা এলিয়ে দিয়েছে কদম। ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুম ভাঙ্গে সেই সন্ধ্যার দিকে। চলে যায় ইঞ্জিন ঘরে। ডিউটি শেষ করে ফিরে আসে মাঝ রাতে। আবার ঘুমিয়ে পড়ে। জেগে ওঠে সকাল বেলায়। জেগে উঠে খুলে দেয় সেই জানালাটা। চোখ জোড়া ছেড়ে দেয় আদি-গন্ত সমুদ্র-বিস্তারে।

সেই সোনালী জল, রুপালী জল, নীল জল।

সোনালী ঢেউ, রুপালী ঢেউ।

সেই ঢেউয়ের আরশিতে যেন নবিতুনের মুখ। বুঝি সোনা-রুপা অলংকার পরা ওই নীল ঢেউগুলোর মতোই ঝলমলিয়ে ডগমগিয়ে হাসছে নবিতুন। বন্দর ছাড়তে না ছাড়তেই বন্দরের সেই উদভ্রান্ত করা, ভ্রষ্ট করা নেশাটাও কেটে গেছে কদমের। এখন নবিতুনের কথাটা মনে পড়তেই নবিতুনের মুখটাও ভেসে ওঠে চোখের সামনে। স্পষ্ট পরিস্কার নবি-তুনের মুখ। সেই শঙ্খশুভ্র বাহু, সেই নীল চোখ জেগে উঠে ঝাপসা করে না নবিতুনের মুখ। বন্দরের এক কারসাজি যেন। নবিতুন বলে যাদু—যাদুর ফাঁদ। সত্যি ফাঁদই বুঝি—বুঝি যাদুরই ফাঁদ। নইলে বন্দরের মেয়েমানুষ, বন্দরের আলো ধাঁধা, বন্দরের বিপণী—হোক তার যত কারসাজি—কেমন করে ভুলিয়ে দেয় ঘরের কথা?

ডি সিলভা হিক্‌স অথবা মন্ত্ত সারেংয়ের মতো কদম তো কখনো উন্মত্ত হয়নি বন্দরের নেশায়। কদম ছোঁয় না হারাম রুজি। কদম ছোঁয় না হারাম পানি। খোদার কছম আছে, বাপের দোহাই আছে, হয়ত সে জন্যই হারামের পথে পা চলে না কদমের।

তবু বন্দরে পা রেখে পা বেঘোর হয়, বেখেয়াল হয় কেন কদম? কেন ভুলে যায় শান্ত বধূ নবিতুনের মুখটি?

নেশা নেশা। না, নেশা নয়। এ সেই যাদুর ফাঁদ, বন্দরের ফাঁদ, যে ফাঁদকে এত ডর নবিতুনের। না ফাঁদও নয়। যাদুও নয়। এ এক ধাঁধা, বন্দরের ধাঁধা। ধাঁধার কোন জবাব নেই কদমের কাছে। চির-কালের নাবিক এ ধাঁধার রহস্যে বন্দী। মুক্তি নেই তার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এও বুঝি সাগরের কেরামতি। কেননা বন্দর থেকে দূরে এই সাগর পানির নীল আরশিতে শুধু নবিতুনের মুখ। বন্দর মেয়ের কথা মনেও পড়ে না কদমের। অবাক হয়েই ভাবে কদম, কত কেরামতি সমুদ্রের।

নবিতুনকে নিয়ে এখন আর দুর্ভাবনা নেই কদমের। রুতুন্দা জাহাজে চড়বার আগেই সালেক সাহেবের সাথে ব্যবস্থা করে এসেছে কদম। তিন মাস বাদ বাদ কোম্পানীর কাছ থেকে মাইনে বাবদ কিছু টাকা নেবে সালেক সাহেব। টাকাটা পাঠিয়ে দেবে বামনছাড়ি।

হিন্দুস্থান পাকিস্তান। টাকা পাঠানোর কত ঝক্কি। তবুও সালেক সাহেব যখন দায়িত্ব নিয়েছে নিশ্চিন্ত কদম। নবিতুন ঠিক মতোই টাকা পাচ্ছে। নিশ্চিন্ত হয়েও মাঝে মাঝে খটকা জাগে মনে। সেই কলম্বোতে চিঠি পেয়েছে নবিতুনের। তারপর ভারত মহাসাগর পেছনে ফেলে আটলান্টিকটাও এপার ওপার পাড়ি দেওয়া সারা, কিন্তু আর কোন চিঠি নেই নবিতুনের। যেখানেই থেমেছে জাহাজটা, সেখানেই একটি করে চিঠি ডাক বাক্সে ফেলেছে কদম। নবিতুনের তরফ থেকে একটি চিঠিরও জবাব নেই, একটি প্রাপ্তি স্বীকার নেই।

কেমন আনমনা হয়ে যায় কদম। খটকা লাগে, চিঠিগুলো কি পাচ্ছে না নবিতুন? কলম্বোতে পাওয়া চিঠিটার ঠিকানা ছিল খিদিরপুরের। বুঝি সালেক সাহেবই ঠিকানাটা কেটে পাঠিয়ে দিয়েছে কলম্বোর দিকে। নবিতুন কি তবে জানে না রুতুন্দা জাহাজের ঠিকানাটা? পায়নি কদমের চিঠি? পেয়েছে নিশ্চয়। পায়নি এমন তো কখনো হয়নি? আসল কথা, নবিতুন তো আর চিঠি লিখতে জানে না, চিঠি লেখার জন্য লোক খুঁজতে হয় ওকে। হয়ত লোক পাচ্ছে না লেখার। তাই এত দেরী।

কিন্তু মনকে তো আর যা খুশী তা বুঝান যায় না? দু'মাস, দু'মাসের জায়গায় না হয় চার মাস লেগে গেল নবিতুনের চিঠি লেখার লোক খুঁজতে।

এদিকে তো বছর ঘুরে এল। এর মাঝেও কি নবিতুন চিঠি লেখার লোক খুঁজে পেল না? না, মনকে অত সহজে বিশ্বাস করতে পারে না কদম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৯

মূর্চ্ছা খেয়েও নবিতুন হুঁশ ফিরে পায়। পড়ে গিয়েও উঠে দাঁড়ায়। কামে যায় চৌধুরীবাড়ী। শেষ করে ফেলে মিজিদের ফরমাশি জাল বোনার কাজটাও। সে জাল হাতে তুলে দিয়ে নিয়ে আস নগদ টাকা। সে টাকায় শাড়ী কিনে হাসি ফোটায় আক্কির মুখে।

কিন্তু চৌধুরীবাড়ীর কাজে লানত। দিকদারী। যতক্ষণ কাজ করে নবিতুন দাওয়ায় বসা ছোট চৌধুরীর চোখ দুটো ওকে লেহন করে চলে। ছোট চৌধুরীকে বুঝি লুন্দর শেখের চাইতেও বেশি ভয় নবিতুনের। শয়তান লুন্দর শেখের মোকাবিলা করেছে নবিতুন। প্রাণ হাতে নিয়ে পালিয়েছে লুন্দর শেখ। নবিতুনের ভয় গেছে কেটে। নবিতুন জানে দ্বিতীয়বার দুঃসাহস দেখাবার আগে হাজারবার ভাবতে হবে লুন্দর শেখকে।

কিন্তু যে ভীতির সাথে সামনাসামনি পরিচয় হয়নি তাকেই তো বেশী ভয় মানুষের।

অন্য জায়গায় কাজ খোঁজে নবিতুন।

কোথাও যাসনে। আক্কিকে সাবধানী দিয়ে বেড়িয়ে পড়ে নবিতুন।

পেছন থেকে শুনতে পায় বড় হিস্যার দাওয়ায় বসা কামিজ বুড়োর গলা—ছোট চৌধুরীর নজর খারাপ! ও কাজটা ছেড়ে দাও তুমি।

ইদানিং কথাটা হামেসাই বলছে কামিজ বুড়ো।

দূর থেকে কামিজ বুড়োর দিকে একটা তির্যক কঠোর দৃষ্টি হেনে গাছগাছালির আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যায় নবিতুন। নবিতুন বুঝতে পারে না ছোট চৌধুরীর বদ নজরটা চোখে পড়ে কামিজ বুড়োর, কিন্তু লুন্দর শেখের বদখেয়ালটা কেন চোখে পড়ে না তার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চৌধুরীবাড়ীর পেছন সীমানায় গাঙ। গাঙয়ের পর ধান ক্ষেত। ক্ষেত পেরিয়ে হাট। হাটের ধার ঘেঁষে মাটির মস্ত মস্ত চাঙ্গর ফেলে দৌড়ে চলেছে ভয়াল নদী কয়ালের খরস্রোত।

কয়ালের তীর ধরে জেলে বসতি। ওরা মাছ ধরে, সঙ্গে সঙ্গেই বিক্রি করে দেয়। বছরখানিক হল হাটের পাশে জেলে বসতিকে ঘিরে রীতি-মত গঞ্জ গড়ে উঠেছে একটা। মহাজন আর ফড়ে ব্যাপারীতে ভরে গেছে গঞ্জ। ওরা মাছ কেনে, সে মাছ লঞ্চ বোঝাই করে চালান দেয় শহরে।

ইদানিং শহরের লোকসংখ্যা নাকি ফেঁপে উঠেছে। সেই লোকেরা মাছ খায়। আর তাই দিন দিন ফেঁপে উঠছে ফড়ে ব্যাপারীর কারবার।

নবিতুন শুনেছে এখানে মেয়েরাও আজকাল কাজ করছে। কাজের সন্ধানেই এসেছে ও।

কিন্তু হাটের উপর পা রেখেই খচ করে ওঠে ওর বুকটা। নবিতুনের মনে সেই সিংগী মাছের কাঁটার খোঁচা! কাঁটার খোঁচায় জর্জর হয়ে চলেছে বুকটা।

কয়াল।

ভীষণ ভয়াল সেই জলরাশি তুফানী প্রলয়ের মত ছুটে চলেছে। ছুটে চলেছে কোন্ অন্ধ উন্মত্ততায়। এরি মাঝে মাঝে তার সমস্ত হিংস্রতা আগ্রাহ্য করে ভেসে বেড়াচ্ছে জেলে ডিঙ্গিগুলো।

ভাঁটির টানে ভেসে চলেছে সারি সারি নৌকো। নৌকোর উপর জালের কাছি ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে জেলের দল।

দূরে স্রোতের উল্টোমুখি চলে গেল একটা জাহাজ। সেই জাহাজের চাকার আঘাত খেয়ে ঢেউগুলো ছলাৎ ছলাৎ আছড়ে পড়ছে কূলে।

পা সরে না নবিতুনের।

কয়ালের দিকে তাকিয়ে স্তব্ধদৃষ্টি দাঁড়িয়ে থাকে নবিতুন। দূরে কয়াল যেখানে গিয়ে মিশেছে সমুদ্রের সাথে সেখানে রুপালী ঝিকিমিকি আর কি এক ধূসর শূন্যতা! সেখানে সেই অসীম দরিয়ার কোন্ অজানায় হারিয়ে গেছে ওর সারেংটি।

সেখানে সেই রুপালী ঝিকিমিকি আর দিগন্তহীন ধূসর শূন্যতা নবিতুন কি কোন্ দিন ফিরে পাবে, খুঁজে পাবে ওর সারেংকে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না। কয়ালের দিকে, সমুদ্র মোহনার ওই উন্মত্ত জলরাশির দিকে তাকাতে পারে না নবিতুন। চোখ ওর ঝাপসা হয়ে আসে। চোখ ফিরিয়ে নেয় নবিতুন।

এই দরিয়ার পানি, দূর সাগরের ওই ঝিকিমিকি আভা—নবিতুনের চিরকালের দুশমন। কদম সারেং কি সে কথাটি বুঝল কোনদিন ?

বুঝেছিল নবিতুনের বাপজান। যেদিন নবিতুনকে কোলে নিয়ে অবাক হয়েছিল, অবাক হয়ে বলেছিল, আরে তুই যে ডাঙ্গর হয়ে গেলি ! সেদিন কী চোখে বাপজানের দিকে তাকিয়েছিল নবিতুন !

হ্যাঁ। ডাঙ্গর অর্থাৎ বড় হয়ে উঠেছিল নবিতুন।

তাই অনেক অভাব, অনেক চাওয়া বুঝি ভাষা খুঁজছিল ওর চোখের তারায়। মেয়ের চোখের সেই অস্ফুট ভাষা বুঝতে পেরেছিল বাপজান। নবিতুনের বাপজান তাই আর যায়নি জাহাজের কাজে।

জেলে বসতির ধার ঘেঁষে নারিকেল বীথি। জেলে বসতি ছাড়িয়ে কয়ালের পার ধরে ধরে অনেক দূর অবধি চলে গেছে নারকেল সারি। মাথায় তার চিরল চিরল পাতা।

পাতায় পাতায় সাগর বাতাসের গুঞ্জন।

সাগর হাওয়ায় দোল খায় নারকেল বীথি। ঋজু বঙ্কিম সুন্দর। নবিতুনের ভাল লাগে। তার চেয়েও ভাল লাগে নারকেল সারির ডানে জেলেদের হোগলা-ছাওয়া ঘরের পেছনে যে উঁকি মারে সবুজ ক্ষেত। তারই এক টুকরো সবুজ কি কখনো একান্ত নিজের বলে দাবী করতে পারে না নবিতুন ? উল্টোমুখি হয়ে তাড়াতাড়ি পা ফেলে নবিতুন।

না।

কয়ালের পাশে যেখানে দরিয়ার থই থই ভয়, যেখানে সাগরের ঝিকি-মিকি সেখানে কাজ করতে পারবে না নবিতুন।

সহসা যেন ভয় পেয়েই বাড়ীর দিকে ছুট দেয় নবিতুন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১০

ছলছল কলকল সাগরের জল। নীল নীল ঢেউ। ঢেউয়ের পিঠে অজস্র বুদ্বুদ, সাদা সাদা ফেণা। দিন রাত বকবক করে ঢেউগুলো। বুঝি তাই অত ফেণা ওদের মুখে।

এক ধ্যানে চেয়ে থাকে কদম। যেন ওই সাগরের বুকে লেখা রয়েছে নবিতুনের খবর।

কার যেন হাতের একজোড়া সহানুভূতি নেবে এসেছে কাঁধে। মুখ ফেরায় কদম।

বাড়ীর কথা মনে পড়েছে বুঝি? মনটা কেমন কেমন করে? চোখ আর মুখে স্নেহ ঢেলে হাসছে মন্ত সারেং।

তিরিশ বছরের অভিজ্ঞ নাবিক মন্ত সারেং। মুখ দেখেই বুঝি টের পেয়ে যায় সব নাবিকের মনের কথা।

তা ভাইপোর যখন মন খারাপ, আজ তোমার ছুটি। যাও উপরে গিয়ে হাওয়া খাও গিয়ে। স্নেহ মেশানো নরম স্বর মন্ত সারেংয়ের।

কদমের কাঁধে রাখা দুখানি হাত মন্ত সারেংয়ের, সে হাতের ঈষৎ চাপে আরও নিবিড় হল স্নেহের স্পর্শ। বলল মন্ত সারেং, চল আমিও যাই। কিন্তু, তার আগে একটু চা। কি বল?

গরম পানি এনে চা করতে লেগে গেল মন্ত সারেং।

শুধু আজ নয় সব সময়ই মন্ত সারেংয়ের স্নেহে কেমন গলে যায় কদম।

মন্ত সারেংয়ের অনেক জবরদস্তি। চোখ রাঙানীতেও হিক্ সাহেবের পরেই মন্ত সারেং। নিষিদ্ধ দ্রব্যের গোপন বেচাকেনায় নীতিহীন বিবেক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বর্জিত মন্তু সারেং। সেই পোপন হাটের প্রলোভনটা কদমের কানে এখনও ফিস ফিসিয়ে বলে মন্তু সারেং। আর প্রলোভন, কুমন্ত্রণা সবই যখন ব্যর্থ তখন রয়েছে মন্তু সারেংয়ের খোঁটা, খোলাখুলি ধমক। কদম জানে ফিরতি খেপে রুতুন্দা জাহাজের কামটা জুটছে না কদমের কপালে। তবু কোনদিন মন্তু সারেংয়ের মুখের উপর একটা কড়া জবাব দিতে পারল না কদম, কেননা মন্তু সারেংয়ের দিলে রয়েছে মহব্বত।

মন্তু সারেংও হয়ত জানে স্নেহের কাঙ্গাল কদম। সেই স্নেহ দিয়েই বুঝি ওকে বশ করবে মন্তু সারেং।

টিন খুলে দুমুঠ মুড়ি বের করল মন্তু সারেং। সেই বাংলাদেশের মুড়ি, সঙ্গে করে নিয়ে চলেছে মন্তু সারেং। দেশের কথাটা যখন খুব বেশী করে মনে পড়ে কেবলমাত্র তখনি বুঝি ঢাকনিটা খুলে এক আধ-মুঠ মুড়ি বের করে নেয়, দাঁতের নীচে কুরুম কুরুম চিবিয়ে চলে মুড়ি-গুলো। মুড়ি আর চায়ের মগটা কদমের দিকে বাড়িয়ে দেয় মন্তু সারেং।

মন্তু সারেংয়ের স্নেহটা বাপজানের কথাই মনে করিয়ে দেয় কদমকে। মনে করিয়ে দেয় ষোল বছরে পাকাপাকি জাহাজী হবার আগেও সেই চৌদ্দ বছর বয়সটির কথা। মনে করিয়ে দেয় চৌদ্দ বছর বয়সে বাপ-জানের সাথে প্রথম এবং শেষবার একই জাহাজে সমুদ্র যাত্রার সেই রোমাঞ্চিত দিনগুলোর কথা। সেটা ছিল যুদ্ধের জামানা। জাহাজটা ছিল ছোট। পথটাও সংক্ষিপ্ত। খিদিরপুর থেকে কলম্বো। কলম্বো থেকেই ফিরে এসেছিল বাপ বেটা!

ফিরে এসে বামনছাড়িতে মাস দুয়েকের বেশী ছিল না মজল সারেং। বেরিয়ে পড়েছিল লম্বা সায়েরে। সেই যে গেল মজল সারেং আর ফিরে আসেনি বামনছাড়িতে।

ধাক করে একটা শব্দ হল। পেছন ফিরে দেখল কদম, দরজাটা ভিজিয়ে বেরিয়ে গেল মন্তু সারেং।

কাপড়ের চেয়ারটা খুলে সাগরের দিকে মুখ করে বসল কদম। আদি তরঙ্গের নিষ্ঠুর হিংস্রতা—এই সাগর, এই সাগর ছিনিয়ে নিয়েছে কদমের বাপজানকে। মর্মান্তিক সেই দিনগুলির কথা অনেকের মুখেই শুনেছে কদম। কিন্তু মন্তু সারেংয়ের বয়ানটা গেঁথে রয়েছে কদমের বুকের ভেতর। মন্তু সারেং ছিল বাপজানের ডান হাত, সেই একই জাহাজের সাথী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিঘ্নসংকুল পথ। চারিদিকে বিপদ। পানির নীচে বিপদ—শত্রুর টর্পেডো। পানির উপর বিপদ—ভাসমান মাইন, শত্রুর যুদ্ধ জাহাজ। বিপদ মাথার উপর আকাশে—শত্রুর বোমারু বিমান। যে কোন সময় যে কোন দিক থেকে পানির অদৃশ্য তল থেকে অথবা আসমান থেকে, পলক না ফেলতেই বিপদ এসে ছোঁকে ধরতে পারে।

শত্রুর শ্যেন দৃষ্টি এড়িয়ে হাজারো সতকর্তা আর আত্মরক্ষার নিখুঁত প্রস্তুতি নিয়ে এগিয়ে চলেছে ওদের জাহাজ। মিত্রপক্ষের বন্দরে পৌঁছিয়ে দিচ্ছে অতি দরকারী ঔষধ-পত্তর, রসদ।

কিন্তু সব সতর্কতাই ব্যর্থ গেল। অকেজো হয়ে রইল আত্মরক্ষার যত আয়োজন—ডেকের উপর আকাশের দিকে তাক করে বিমান বিধ্বংসী কামান, মাইন সুইপার, ডেস্ট্রয়ার, জঙ্গী জাহাজের রক্ষাব্যূহ। পানির তলা থেকে জার্মান টর্পেডো ফুটো করে দিয়েছে ওদের জাহাজ। গল-গলিয়ে পানি ঢুকছে ওদের জাহাজে। কিছুক্ষণের মধ্যে কয়েক টুকরো হয়ে ডুবে গেল জাহাজখানা।

ডুবন্ত তরীর অসহায় নাবিকের দল। ডিনামাইটের বিস্ফোরণে কারো শতচ্ছিন্ন দেহ উৎক্ষিপ্ত হল আকাশের দিকে। তারপর হাত পা অস্থি আলাদা আলাদা ঝুপ ঝুপ পড়ে গেল সাগরজলে। কেউবা আস্ত ছিঁটকে পড়ল। ঢেউয়ের ঝাপটায় তলিয়ে গেল। মৃতদেহ হয়ে ভেসে উঠল কিছু দূরে। অন্যরা কর্তব্যপরায়ণ কাপ্তানের সুশৃংখল নির্দেশে একে একে ঝাঁপিয়ে পড়ল মাজা সমান উঁচু সব তরঙ্গের রুদ্র বুকে। কেউ বা বাঁচল। বাকীরা হল সামরিক অর্থে নিখোঁজ, লৌকিক অর্থে মৃত। মন্তু সারেং কোন উদ্ধারকারী জাহাজে উঠে বেঁচে গেল। যুদ্ধের খাতায় নিখোঁজের তালিকায় স্থান পেল মজল সারেং।

এখানেই শেষ। এখানেই থামত মন্তু সারেং। দুচোখের সহানুভূতি ভরা দৃষ্টিটা রাখত কদম সারেংয়ের উপর। তারপর চোখজোড়া অকস্মাৎ ফিরিয়ে নিত সাগরের দিকে। কী এক বিক্ষোভ বেরিয়ে আসত মন্তু সারেংয়ের বুক ফুড়ে...এই, এই সেই আটলান্টিক। বড় পাজি বড় নচ্ছার এর পানি। নচ্ছার.....নচ্ছার। বিশাল বিশাল ফেনিয়ে-ওঠা ঢেউগুলোর দিকে স্থির চোখ কদমের। নচ্ছার পাজি হৃদয়হীন ওই সাগরটার উপর মন্তু সারেংয়ের মতো কদমের অনেক রাগ। এই সাগর কেড়ে নিয়েছে ওর বাপজানকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাটির মানুষ, মাটিতেই কবর নেয় ওরা। কিন্তু সাগরের মানুষ। তার কবর তো সাগরের শয্যায়। এটাই তো স্বাভাবিক। উল্‌টোটা উল্‌টোই। সেটা ব্যতিক্রম। হয়ত তাই এত রাগ নিয়েও সাগরের প্রতি কী এক টান কদমের, বার বার সাগরের কাছেই ফিরে আসতে হয় ওকে।

বাপজান মিশে আছে নীল নীল ওই ঢেউয়ের সাথে। রূপ তার ভেসে বেড়ায় দিগন্তবিসারী ওই পানির কোলে। বাপজানই সমুদ্র চিনিয়েছে কদমকে। বাপজানই সমুদ্রের অচ্ছেদ্য বন্ধনে বেঁধে গেছে ওকে। তাই কি এত রাগ নিয়েও সমুদ্রকে ভালবাসে কদম ?

দিন যায়। রাত যায়। রুতুন্দা সাঁতার কেটে চলেছে।

কূলের নিশানা নেই। ইশারা নেই একটুখানি সবুজের। সামান্য চিহ্ন নেই লোকালয়ের শক্ত মাটির—যেখানে বাস করে মানুষ। শুধু পানি আর পানি। পানির নাচন। তরঙ্গের আস্ফালন।

এমন গহিন সাগরে কার না ভয় জাগে? কার না বুক কাঁপে? কিন্তু রুতুন্দা জাহাজের নাবিক, অনেক সাগর দেখা, অনেক যুদ্ধজয়ী নাবিক ওরা। ওদের ভয় নেই। ওরা জানে কূল আসবেই।

ওরা জানে এমনি করে পানি ভাংতে ভাংতে একদিন দূরে, বহু দূরে দেখা যাবে তটরেখা। স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হবে সাগর আর মাটির সীমানা।

এসে যাবে বন্দর। রুতুন্দা উজার করে ঢেলে দেবে তার বুকের ধন, পৃথিবীর নানা দেশের নানা মানুষের তৈরী প্য সম্ভার। আবার নতুন পণ্যে নতুন ধনে খালি বুকটা ভরে নেবে রুতুন্দা। সাঁতার দেবে আর এক মহাসাগরে, আর এক মহাদেশের উদ্দেশ্যে। এমনি করে সাগরে সাগরে পানিতে আর মাটিতে দেশে দেশে আর মানুষে মানুষে মিতালির দূত হয়ে অবিরাম ছুটে চলবে রুতুন্দা।

সেই রুতুন্দার ছোট সারেং কদম। সাগর যার বাপের কবর। বামন-ছাড়ির মাটিতে যার ঘর। কথাগুলো ভাবতে গিয়ে যেন আনন্দের রেশ পায় কদম, কি গর্বে ফুলে ওঠে ভেতরটা।

কাপ্তানের পুলটার উপর দাঁড়িয়ে আছে কদম। সারা জাহাজে এই জায়গাটির যেমন বিশিষ্ট মর্যাদা তেমনি রয়েছে একটি উন্মুক্ত নিরালা সৌন্দর্য। একটু দূরে চোখে দূরবীন লাগিয়ে চারিদিকে দেখছে কাপ্তান হিক্‌স।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আকাশে সূর্য আছে। কিন্তু রোদ নেই। দূরে যেখানে সাগরের নীল আর আকাশের নীল গায়ে গায়ে মিশে শুয়েছিল এতক্ষণ সেই নীলোজ্জ্বল দিগ্‌বলয়টা ঢাকা পড়েছে কালো মেঘের নীচে।

অজস্র মেঘ। সমুদ্রের বুক থেকে উঠে যাচ্ছে আকাশের দিকে মিছিল করে। যতই উপরে যাচ্ছে ফুলে যাচ্ছে, ফেঁপে উঠছে, ছড়িয়ে পড়ছে রাশি রাশি। ছড়িয়ে পড়ছে আকাশময় নানা আকারে নানা বর্ণে। সূর্যের সাথে সমুদ্রের চিরকালের সখ্য। সেটা বুঝি পছন্দ নয় ওই মেঘগুলোর। নাবিকেরা চেয়ে চেয়ে দেখে সাগরের আকাশে মেঘমালার চিরন্তর খেলা। কদম দেখে। দূরবীনটা চোখ থেকে নামিয়ে কাপ্তান হিক্‌সও বুঝি তাই দেখছে, সীসা রং একটি মেঘ। কপালে তার তকতকে হীরকের মতো সাদা রং মেঘের মস্ত বড় এক টিপ। একটি গোলাপী বর্ণা মেঘ, মাথায় তার কালো মতো জটা, সেই মেঘটা দৌড়ে এসে গিলে ফেলল সীসা রং মেঘটাকে। সীসা রং মেঘটাকে আর দেখা যায় না।

ছিমছাম গঠন লম্বাকৃতি একখানি মেঘ কুন্ডলী পাঁকানো ধোঁয়ার মতো ঘুরতে ঘুরতে উঠে আসে উপরের দিকে। মাঝ আকাশ অবধি উঠেই ভেঙ্গে গেল মেঘটা। অসংখ্য হয়ে চঞ্চল পায়ে হাল্কা ডানায় উড়ে চলে গেল। এমনি সব মেঘের খেলা সাগরের আকাশে। এ খেলার কোন শেষ নেই। যেমন শেষ নেই কদমের পায়ের নীচে ওই অশান্ত স্রোতের।

যেন আচমকাই সমুদ্রের পাঁজর ছিঁড়ে বেড়িয়ে এসেছে অনেকগুলো কালো মেঘ। কালোর মাঝেও বিচিত্র বর্ণ আর গোত্র ভাগ ওদের। কোনটা কাজল কালো, কোনটা ধূসর কালো, কোনটা হালকা ধাঁচের, কোনটি বা নিকষ আঁধারের মতো কালো।

দৌড়ে আসে কালো মেঘশ্রেণী। দৌড়ে এসে গ্রাস করে ধলা মেঘ, বেগুণী মেঘ, তামা রং মেঘ, সমস্ত মেঘ। বিশাল এক কালো মেঘ একে একে লঘু পায়ে উড়ে বেড়ান সব মেঘগুলোকেই রাহুর মতো গিলে ফেলল। গিলে নিয়ে স্ফীততর হল।

সাগর আর আসমানের চেহারাটা গেল বদলে। সমুদ্র হলো গোমরা মুখ। আকাশ হলো কালো মুখ, বিষন্ন।

যে আকাশের দিকে চেয়ে বিপন্ন নাবিক দিক খোঁজে, ভরসা খোঁজে, যে আকাশের স্থির প্রশান্তি প্রিয়াবিরহী নাবিকের বুক দেয় ভরে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেই আকাশটার অমন কালো মুখ দেখে বুঝি ব্যথায় ভরে যায় নাবিকের মন। মেঘেডোবা আকাশের ব্যথা ওরা কে-ই বা বোঝে এমন করে? এ যেন হিংসাকাতর ঈর্ষাতুর ওই কুৎসিৎ কালো মেঘটার গভীর এক ষড়-যন্ত্র, সমুদ্রের বিরুদ্ধে, সমুদ্র-বিচারী নাবিকদের বিরুদ্ধে। যেন আঘাত পেয়েই দৃষ্টিটা পানির দিকে ঘুরিয়ে নেয় কদম।

বেতার ঘরের অপারেটার এসে কি যেন খবর দেয় কাপ্তান হিক্‌সকে। চঞ্চল আর অস্থির হয়ে ওঠে কাপ্তান হিক্‌স। বাজিয়ে দেয় বিপদের সংকেত ঘন্টা। জোরে জোরে ডাক দেয় ভেঁপু।

'এস ও এস' এসেছে। বিপন্ন কোন জাহাজের ডাক এসেছে—'বিপদে রক্ষা কর'। জাহাজ ডুবছে।

সংগে সংগে ঘুরে গেল রুতুন্দার গতি। বেতারের সংকেত ধরে ছুটে চলল। ইঞ্জিনের যত জোর, প্রপেলারের যত শক্তি, সমস্ত শক্তি দিয়ে ছুটে চলল রুতুন্দা।

রুদ্ধশ্বাসে পল গুণে চলে রুতুন্দার নাবিক। ওরা প্রস্তুত। বিপদের সাজ সরঞ্জাম আর পোশাক লয়ে তৈরী ওরা! ওরা ঝাঁপিয়ে পড়বে গহীন পানিতে, বুক দিয়ে ঢেকে দিবে সমুদ্রটাকে, রক্ষা করবে বিপন্ন যাত্রীদের। এই তো নাবিকের ধর্ম।

অকুস্থলে পেঁছে গেল ওরা।

জাহাজটা ডুবছে। ওটাকে ভাসিয়ে রাখার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ গেছে। ঝপাঝপ জীবন তরীগুলো ভাসিয়ে পানিতে নেবে পড়ল রুতুন্দার দক্ষ নাবিক কদম সারেং, মন্ত সারেং, ডি সিলভা আরও অনেকে। পানির দিকে নাবিয়ে দিল দড়ির সিঁড়ি। উপরে দাঁড়িয়ে তদারক করছে কাপ্তান হিক্‌স। শিশু, নারী আর মায়ের দল। ওদেরই রক্ষা করতে হবে সবার আগে। এটা আন্তর্জাতিক ধর্ম। ওরা উঠে আসে নৌকোয়। জোরে জোরে বৈঠা ফেলে রুতুন্দার নাবিক। আসমানি উঁচু ঢেউগুলোকে অগ্রাহ্য করে চলে ওদের নৌকো। এক একটা দলকে নিরাপদে রুতুন্দায় তুলে দিয়ে আবার ছুটে যায় ওরা।

ইতিমধ্যে এসে গেছে আর এক জাহাজ। ওরা লেগে গেছে উদ্ধারের কাজে। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি ডুবছে জাহাজটা, সব যাত্রীকে বাঁচাতে পারল না ওরা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্রুত ডুবছে জাহাজটা। এখনো অনেক যাত্রী জাহাজে। জোরে, আরও জোরে বৈঠা ফেলে কদম সারেং, মন্তু সারেং, ডি সিলভা।

কান্নার রোল পড়েছে রুতুন্দা জাহাজে। যে শিশু রক্ষা পেল, বাবা তার এখনো ডুবন্ত জাহাজে। যে বধূ পৌঁছল নিরাপদ আশ্রয়ে, মাত্র কয়েক হাত দূরেই স্বামী তার তলিয়ে চলেছে জলের অতলে ওরই চোখের সুমুখে। তাই শিশু আর মেয়েরা কান্না জুড়েছে। ওদের আকুল কান্না ছাপিয়ে যায় সমুদ্রের গর্জন।

জোরে আরোও জোরে বৈঠা ফেলে কদম সারেং, মন্তু সারেং, ডি সিলভা কিন্তু না, সব যাত্রীকে বুঝি বাঁচান গেল না। জোয়ানরা ইতি-মধ্যেই ঝাঁপিয়ে পড়েছে অগাধ পানিতে ঢেউয়ের সাথে যুঝে ওরা সাঁতার কাটছে দু পাশের উদ্ধারকারী জাহাজ দুটোর দিকে। কাপ্তান হিক্‌স ওপর থেকে ছুঁড়ে দিয়েছে বয়া আর লাইফবেল্ট।

তবু সবাইকে কি বাঁচাতে পারল কদমের দল? যারা ভেসে গেল তাদের জীবনের পারে টেনে তুলবার কোন উপায় নেই। তবুও এদিকে ওদিক আর একবার ভাল করে দেখে নিল ওরা। তারপর বাজিয়ে দিল ভেঁপু। রুতুন্দার খোলা ডেকে বসে হাঁপাচ্ছে কদম। ওর নাবিক জীবনের এ অভিজ্ঞতা প্রথম।

রুতুন্দা জাহাজটা দুলে উঠল। ক্লান্তিতে বুজে আসা চোখটা বারেক মেলে দেখল কদম, খানিক দূরে ডুবে যাওয়া জাহাজের মাস্তুলের মাথাটা এখনো জেগে রয়েছে পানির ওপর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১১

তোর খুব কষ্ট হয়েছে, নারে নবিতুন ?

হুঁ হাঁ কিছু বলে না নবিতুন। শুধু কদমের আলিংগনের মাঝে কুঁ কুঁ অস্ফুট এক খুশির শব্দ তুলে সামান্য একটু কেঁপে যায় মাত্র। শরীরটাকে গুটিয়ে নিয়ে কেমন ছোট্টটি হয়ে আসে নবিতুন। আরো নিবিড় হয়ে সেঁটে যায় কদমের বুকের ভেতর।

কদম অনুভব করে তুলতুলে নরম কুসুম কুসুম গরম ওর নবিতুন। কদম অনুভব করে ওর বুকের উমে কেমন নিশ্চিত নবিতুন। পাটিপাতা ডাঁটির মতো চিকন-চাকন মসৃণ কালচে-সবুজ দুখানি বাহু নবিতুনের। কদমের গলায় লতিয়ে রয়েছে সে বাহু।

শালতি শালতি হাত কদমের। সে হাতের পীড়নে বুঝি গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে কদমের ভেতর মিশে যায় নবিতুন। কুঁ কুঁ অস্ফুট সেই মৃদু গুঞ্জন তুলে বুঝি মূর্ছা যায় নবিতুন।

সকাল হয়েছে সেই কখন। বাইরে গিয়ে কত কাজ সেরে এসেছে নবিতুন। বাসি ফেন দিয়ে কুঁড়ো মেখে খাইয়েছে হাঁস মুরগিগুলোকে। আন্ডাপাড়া মুরগিটাকে বেঁধে রেখেছে। বজ্জাত মুরগি চুপেচাপে কোরবানদের ঘরে গিয়ে ডিম পেড়ে এসেছে গতকাল। তাই নবিতুন খের ভর্তি কোরার ভেতর মুরগিটাকে বসিয়ে তার পা-টা বেঁধে দিয়েছে ঘরের পালার সাথে। কাজকর্মগুলো সেরে ও আক্কিকে পাঠিয়ে দিয়েছে মিজিবাড়ী। মিজিদের ঝাঁকি জালটা চেয়ে আনবে।

তারপর ঘরে ঢুকে সারেংয়ের আনা নতুন আরশিটার সুমুখে দাঁড়িয়েছে নবিতুন। বাস তেলের বোতল খুলে হাতে নিয়েছে একটুখানি তেল। দু'হাতের তালুতে মেখে নিয়েছে তেলটা। একটি ফোঁটাও যাতে না পড়ে যায় মাটিতে, তাড়াতাড়ি তেলমাখা হাতের দুটো তালু বিছিয়ে দিয়েছে মাথা ভর্তি চুলের উপর। আস্তে আস্তে চুলগুলো পাট করে খোঁপা বেঁধেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তেলের ভুরভুর সুবাসটা ছড়িয়ে পড়েছে ঘরময়। বুঝি তার চেয়েও বেশী সুবাস নবিতুনের মনের ভেতর। সুগন্ধে ভরে যায় ওর মনটা। কেমন ফুলে ফুলে নিঃশ্বাস টানে ওর বুকটা। কাংগইটাকে নাকের কাছে এনে গন্ধ টানে নবিতুন। সুগন্ধমাখা হাতজোড়া অনেকক্ষণ ধরে রাখে নাকের ওপর।

তারপর কাংগইটাকে পরিষ্কার করে রেখে দেয়। টেনে নেয় 'পাউ-টারের' কৌটোটা। ওই 'পাউটারে' একই সুবাস, তেলটার চেয়ে একটু বেশী উগ্র। চালের গুঁড়ির মতো মিহিন গন্ধভরা 'পাউটার', কয়েক চিমটে হাতে তুলে নেয় নবিতুন। আস্তে আস্তে ঘষে ঘষে গালে মাখে। এ ভাবেই নাকি মাখতে হয়, কদম ওকে দেখিয়ে দিয়েছে। 'পাউটার' মাখা শেষ হলে কৌটোটা বন্ধ করে রেখে দেয় টিনের তোরংয়ে।

এমনি সময় মনে পড়ে যায় গত বিকেলে ভিজিয়ে রাখা রস পিঠে-গুলোর কথা। হাঁড়ির ঢাকনিটা খুলে পিঠেগুলো দেখে নেয় নবিতুন। টিপে টিপে দেখে। না, রসে ভিজে, রস খেয়ে ফুলে উঠেছে, নরম আর টসটসে হয়ে আছে পিঠেগুলো। নবিতুনের আংগুলের সামান্য চাপ খেয়েই দু'ফাঁক হয়ে গেছে একটা পিঠা। ভারি খুশি লাগে নবিতুনের। রসে ভেজা এই চিতই পিঠা খুব ভালবাসে কদম।

আবারও আরশিটার সুমুখে এসে দাঁড়ায় নবিতুন। পাটিপাতা রং মুখটা ওর সুন্দর। 'পাউটার' লেগে বুঝি আরো সুন্দর হয়েছে সে মুখ।

অজানতেই ওর হাতটা চলে যায় তোরংয়ের দিকে। তোরং থেকে তুলে আনে একটি কাঁচের কৌটো। ঢাকনাটা খুলে মুখের কাছে এনে গন্ধটা শোঁকে নবিতুন। চমৎকার গন্ধ। বাস তেল আর 'পাউটারের' চেয়েও চমৎকার। কৌটোটার ভেতর ধবধবে সাদা তরল মতো কি যেন ছাই, নামটাও মনে থাকে না নবিতুনের। বড় ঠান্ডা জিনিস। নখের আগায় সামান্য একটু তুলে নিয়ে কি ভেবে কৌটোটা বন্ধ করে তোরংয়ে রেখে দেয় নবিতুন। না 'এস্‌সনোটা' এতক্ষণে মনে পড়ল। নামটা একটুও ভাল লাগে না নবিতুনের। সেই বিয়ের সময় প্রথম যখন এনে দিয়েছিল কদম, তখনও না। এখনও না। কেমন ভেজা ভেজা ঠান্ডা ঠান্ডা। গালের চামড়ায় পাতলা কাইয়ের মতো লেগে থাকে। বিশ্রী লাগে নবিতুনের। কাজ সারা, কাজ সারা নবিতুনের। অথচ লোকটা এখনো ঘুমোচ্ছে। এই, ওঠ ওঠ। চৌকিটায় একটা ঝাঁকিনি দিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লোকটার পাশে বসে নবিতুন। কিন্তু মজল সারেংয়ের ব্যাটাটা এখনো বড় ত্যাঁদড়। ঘুমোয়নি। ঘুমের ভান করে শুয়ে দেখছিল নবিতুনের সাজ। লোকটা ফিরে আসার পর রোজই তো এমনি করে সাজে নবিতুন। সাজ সেরে ওকে ডাক দেয়। আজও ডাকতে এসেছে। অমনি সাঁ করে দুটো হাত বাড়িয়ে ওকে টেনে নেয় কদম। টেনে নিয়ে পুরে রাখে বুকের ভেতর।

বাইরে এখন রোদের ঢল। বেড়ার ফুটো দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা রোদ এসে রোদের ঝাঁঝরি বানিয়েছে মাটির মেঝেতে।

কদমের বুকের ভেতর তুলতুলে নরম কুসুম কুসুম গরম নবিতুন আর শব্দ করছে না, কাঁপছে না। নবিতুন এখন তৃপ্তি আর সার্থকতার শেষে ঝরে পড়া পাতা। অবশ। নিস্পন্দ। নিথর।

যেন ভাল করে দেখবার জন্য ওর মুখটাকে বুকের তলা থেকে তুলে আনল কদম। কয়েক ফোঁটা রোদ দৌড়ে এসে চিকিমিকি এঁকে গেল নবিতুনের মুখে। কালচে-সবুজ পাটিপাতা মসৃণ নবিতুনের মুখ, রোদের চিকিমিকি ফোঁটায় আরো সুন্দর। আরও সুন্দর নবিতুন, কেননা, একটুক্ষণ আগের সেই সার্থকতায় ঝরে-পড়ার আনন্দটি এখনো লেপে রয়েছে ওর মুখে। চোখ-বোজা নবিতুন এখন সার্থকতার নিটোল ছবি।

বাইরে বুঝি আকবরের পায়ের আওয়াজ। ধড়ফড়িয়ে উঠে বসে নবিতুন। বিস্রস্ত শাড়িখানা শরীরে প্যাঁচিয়ে নেমে পড়ে চৌকি ছেড়ে।

কিন্তু টান পড়ে আঁচলে। ওর মুখটাকে তখন গালের উপর টেনে দিয়েছে কদম।

নবিতুন বলে, ছিঃ।

আবারও ছিঃ? ওর মুখটা ছেড়ে দিয়ে মিটি মিটি হাসে কদম। ছিঃ মানে কি, নবিতুন কি ভুলে গেছে? বুঝি সে-কথাটা মনে করেই হাসছে কদম। ছিঃ বলেও সরে যেতে পারে না নবিতুন। সারেংয়ের মুখের ওই হাসিটা চুম্বকের মতো টেনে রাখে ওকে। সাগর ফেরা মানুষ। দেশ দেশান্তর যার নখের ডগায়। সেই কদম সারেংই বুঝি অমন করে হাসতে জানে। আর কেউ পারে না ওর মত হাসতে। চোখ নামিয়ে নেয় নবিতুন।

সাগর ফেরা নাবিক। তার বুঝি তিয়াস মেটে না। আবারও হাত বাড়ায় কদম। ছিঃ মেয়েটা এসে পড়বে যে! দৌড়ে পালিয়ে যায় নবিতুন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তৃপ্তির সাথে ফুরুত ফুরুত রস টেনে টেনে রস পিঠে খায় কদম। মাঝে মাঝে দু একটা তুলে দেয় আক্কির খোরায়। অমনি ওর হাতটা চেপে ধরে নবিতুন, বলে, মেয়ে তো সারা বছরই খাচ্ছে। তুমিও খাও। বিদেশে কি পাওয়া যায় এসব ?

বিদেশে যে আরও কত কি পাওয়া যায়, বামনছাড়ির নবিতুন বা আক্কি যা চোখেও দেখবে না কোনদিন, সে সব কথায় না গিয়ে কদম একটা পিঠে ফেলে দেয় আক্কির খেরায়। বলে, আহা সারা বছর যেন রস পিঠে বানাস তুই। বানায় নাকিরে আক্কি ?

আর্ধেকখানি পিঠে মুখে পুরে দিয়েছে আক্কি। ভর্তি গাল নিয়ে বাবজানের প্রশ্নের উত্তর দেয়ার উপায় নেই ওর।

কিন্তু নবিতুন সঙ্গে সঙ্গেই আরও দুখানি পিঠে আর এক করসুল রস ঢেলে দিয়েছে কদমের বাসনে।

কদম হাসে। হাতে উঠিয়ে নেয় একখানি পিঠে। হাতটা এগিয়ে দেয় নবিতুনের মুখের দিকে। বলে, নে এটা তুই খা।

ফস করে মুখটা ঘুরিয়ে এক হাত সরে যায় নবিতুন। চোখ শাসায়। দাঁত কামরায়। দাঁতের নীচে ঠোঁট চেপে ধরে সাবধান করে দেয় কদমকে। সাবধানীটা একটুও মানে না কদম। হাতটা আর একটু লম্বা করে বলে, খা। ছিঃ ছিঃ দিনে দিন আক্কেল আন্দাজের যেন মাথা খাচ্ছে সারেং। বিদেশ ঘুরে ঘুরে হায়া-শরম খুইয়ে এসেছে সব। বিয়ের লায়েক মেয়ের সামনে অমন করে হাত বাড়িয়ে বলে কিনা, তুই খা। ছিঃ ছিঃ।

ছি ! রীতিমত চোখ পাকিয়ে ধমকে উঠল নবিতুন। বুঝি নিরস্ত্র হয় কদম। নিরস্ত্র হয়ে শুধায়, তোর জন্য রেখেছিস ? দেখি হাঁড়িটা ?

ত্রস্তে হাঁড়িটার দিকে হাত বাড়ায় নবিতুন। কিন্তু ততক্ষণে ঢাকনা খুলে হাঁড়িটা দেখেছে কদম। পিঠে নেই একটাও। একেবারে তলায় ছোট ছোট কয়েকটা ভাংগা পিঠের টুকরো, একটু রসের তলানী।

হাতের পিঠেটা টুপ করে হাঁড়ির ভেতর ফেলে দেয় কদম।

ফিক করে হেসে দেয় নবিতুন।

জালটা নিয়ে যাও। খুব মাছ উঠেছে গাংয়ে। মিজি বাড়ী থেকে চেয়ে আনা জালটা কদমের হাতে তুলে দেয় নবিতুন। বলে আবার, অন্য মাছ ধর আর না ধর, দুটো ইচাঁ মাছ ধরবেই।

ইচাঁ মাছ ? মাত্র দুটো ইচাঁ মাছ দিয়ে করবি কি ? শুধায় কদম। আর ওর নজরে পড়ে কুলোর উপর ছড়ান এক গুচ্ছ ঢেঁকিশাক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নবিতুনের খুব পছন্দ ঢেঁকি শাক। কদমেরও। তবে রান্নাটা হতে হবে ইচাঁ মাছ দিয়ে।

উপুর হয়ে ঢেঁকিশাকের আগাগুলো এলোমেলো করে দেয় কদম। আক্কির সুমুখে শরমে বুঝি মাটির তলায় পালিয়ে যেতে চায় নবিতুন। সেই কবে, ঢেঁকিশাক কুরুতে গিয়েই তো 'মরণ' হয়েছিল নবিতুনের।

সাগর ফেরা নাবিকের সেই হাসি। সেই হাসি দিয়ে নবিতুনের কলজেটা টেনে নিয়ে বেরিয়ে গেল কদম। জালটা ওর পিঠে।

বুয়া গো বুয়া। তোমায় দেখে হিংসায় মরি। বয়স বাড়ে মানুষ হয় বুড়ো, এই-তো জানি। কিন্তু তোমার বেলায় সব নিয়মই যেন উল্টো। বয়স বাড়ছে আর তোমার জোয়ানকিটা কেবলই ফেটে পড়ে। শরবতি এসে হেসে ঢলে পড়ে নবিতুনের পিঠে।

শ্বশুর বাড়ী বছর কাবার করে আবারও নাইওর এসেছে শরবতি। ওর ছেলেটা এখন হাঁটতে শিখেছে।

হিংসা করিস না? খুশীতে মনটা ডগমগ, তবু কৃত্রিম কোপে মুখভার করে শুধায় নবিতুন।

হিংসা করব না? দেখ না আমার দিকে চেয়ে। এক বিয়ানীতেই কেমন বুড়ি হয়েছি। আর তুমি? এখনো যেন আবিতি কন্যা। হয়ত চাপা কোন দুঃখ আছে শরবতির। কিন্তু বলে ও তেমনি হেসে-ঢলে!

ততক্ষণে আরো অনেকেই এসে পড়েছে। কোরবানের বৌ এসেছে। গুজাবুড়ি এসেছে। আর যারা কখনো আসেনি দুঃখের দিনে—বেরা বাড়ীর সমিরণ, বেপারীবাড়ীর টুক্কির মা ওরাও এসেছে নবিতুনের সুখ দেখতে।

তাই তো বলি রূপ আজ এত খোলতাই কেন? এ কোন দেশের নক্শা গো নবিতুন বুয়া। এতক্ষণে বুঝি নবিতুনের শাড়ীটার উপর দৃষ্টি পড়েছে শরবতির। কলে বোনা পাতলা সবুজ জমিনের উপর ময়ূর আঁকা শাড়ী। শরবতি আচলটাকে একেবারে চোখের কাছে এনে গভীর মনোযোগে দেখে ময়ূরের ছবি।

টুক্কির মা আঁচলটা একবার ধরেই রেখে দেয়। বলে, ওমা! একী শাড়ী গো। পাড় নেই?

সবিস্ময়ে দেখলো ওরা। সত্যি পাড় নেই শাড়ীটার। পাড় নেই সে কেমন শাড়ী! সে তো তেনা, তেনারই সামিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আঁচলটা ছেড়ে দিয়ে শরবতিই জবাব দেয় সন্দেহবাদী টুক্‌কির মার। বলে, বেপারী বাড়ীর বাইরে তো আর যাও না। ভাল মানষের বৌরা সব পাড় ছাড়া শাড়ী পড়ে আজকাল। সে খবর রাখ ? চৌধুরী বাড়ীর ছোট বৌর ছাপা শাড়ীগুলো দেখেছ ?

এককথায় বুঝি চৌদ্দ কথা শুনিয়ে দেবে শরবতি। বলেও কি বিপদে পড়ল টুক্‌কির মা! তাড়াতাড়ি পানের বাটাটা টেনে নিয়ে চোখ নাবায় টুক্‌কির মা।

সুপুরীর কৌটোটা ওদের সুমুখে। এগিয়ে দেয় নবিতুন। নিজেও একটা খিলি পুরে দেয় মুখে। তারপর ময়ূর আঁকা শাড়ীটাকে বার বার মেলে দেয় ছড়িয়ে দেয়া পায়ের কাছে, বুকের দিকে পিঠের উপর। ওরা দেখুক। ঢেঁকি শাকগুলো কোটা হয়ে গেছে নবিতুনের। এবার কাঁঠালের বিচিগুলোর খোসা ছাড়াচ্ছে ও। ওর দেখাদেখি অন্যরাও তুলে নেয় মুঠ ভরে। খোসা ছাড়ায়। ছাড়ান বিচিগুলো জাতিতে ফেলে কুটুর কুটুর কেটে চলে নবিতুন। তারই ফাঁকে ফাঁকে চলে ওদের কথাবার্তা।

জাঁতি চলে কুটুর কুটুর। আর টুনটুন বাজে নবিতুনের হাতের চুড়ি। কবজি থেকে কুনুই অবধি চুড়িতে ভরা নবিতুনের হাত। কত রংয়ের কত কিসিমের চুড়ি। বেলোয়ারী চুড়ি। প্লাস্টিকের চুড়ি। লাল চুড়ি। আর ওদের মাঝে রাণীর মতো দুগাছি রুলি।

সোনার মতোই চকচকে রুলি জোড়া। আসলও হতে পারে। মিশলেও হতে পারে। তবে সোনা যে কিছু আছে ওতে, সন্দেহ নেই কারো।

জাঁতিটা ওঠে আর পড়ে। আঙুলগুলো, হাতের কব্জিটা দরকারের চেয়ে একটু বেশী করেই বুঝি নড়ে আর বেলোয়ারি চুড়ির বাজনা বাজে টুনটুন ঠুনঠুন। দু চোখ বিস্ফারিত করে থাকে সমিরণ, টুক্‌কির মা।

হাতটাকে জাঁতির উপর স্থির করে ধরে রাখে নবিতুন। ওরা দেখুক। আর একটু ভাল করে দেখুক।

ওরা দেখে, কোরবানের বৌ আর শরবতির হাতেও বেলোয়ারি চুরি। নবিতুন দিয়েছে ওদের!

কুচি কুচি করে বিচিগুলো কাটা সারা হয়ে গেল। হাঁড়িতে পানি ভরে কুচিগুলো ভিজিয়ে রাখল নবিতুন। কদমের প্রিয় হইল্যা মাছের শুটকি দিয়ে কাঁঠালের বিচি রান্নাটা রাতের জন্য করবে নবিতুন। কুচিগুলোকে তাই ভিজিয়ে রাখতে হবে দিনভর। তবেই রান্নার পর দাঁতের তলায় পড়ে গলে যাবে মোমের মত। স্বাদ হবে মনের মতন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খোসাগুলো বাইরে ফেলে দিয়ে হাতটা ধুয়ে নিল নবিতুন। তারপর হাত দুটো উঠিয়ে নিল খোঁপার দিকে, খোঁপাটাকে একটু আঁট করে বাঁধবে। অমনি চুরিগুলো যেন খিলখিলিয়ে উঠল। সবগুলো চুড়ি ঝনাক করে নেমে এল কুনইর দিকে।

বেড়ার ফুটো দিয়ে একরাশ রোদ চ্যাপটা হয়ে লেগে আছে নবিতুনের হাতের পিঠে। সে রোদে ঝকমকিয়ে উঠেছে নীল চুড়ি লাল চুড়ি। হাত দুটো ঘুরিয়ে দুলিয়ে খোঁপা বাঁধল নবিতুন। যেন ইচ্ছে করেই হাত জোড়া খোঁপার উপর অনেকক্ষণ ধরে রাখল নবিতুন। ওরা দেখুক।

ওরা দেখছে। লাল চুড়ি নীলচুলি ধাঁধা ফেলছে ওদের চোখ।

খোঁপা বাঁধা হয়ে গেল। হাত দুটো নামিয়ে আনল নবিতুন। টি-নি-নি-রি-নি-নি ঝনাক করে চুরিগুলোও এ ওর গায়ে হেলে পড়ে নেবে এল কব্জির দিকে।

ওরা দেখল নবিতুনের সুখ। দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল বেরাবাড়ীর সমিরণ, বেপারী বাড়ীর টুক্‌কির মা। নবিতুনের সুখে নিজের নিজের দুঃখের কথাই বুঝি মনে পড়ে ওদের। তাই যাবার আগে আর একটি দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ওরা। ওরা চলে গেল।

সগির মা গুজাবুড়ি। সেও চুপচাপ দেখছে নবিতুনের সুখ। এতক্ষণ কোন কথা বলেনি ও। এবার এক কান্ড করে বসল। হঠাৎ নবিতুনকে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল গুজাবুড়ি।

ওরে আমার বোনঝি! আমার বুকের ধন। বলিনি? সত্যি সত্যি কাঁদছে গুজাবুড়ি। শোকে অথবা আনন্দে। চোখ গড়িয়ে তার জলের ধারা। বুঝি থ মেরে যায় নবিতুন! থ মেরে বসে থাকে শুকনো আর শক্ত চেলা কাঠের মতো গুজাবুড়ির দুখানি হাতের বেড়ে।

আহা কত শুনেছি কোরাণ কিতাবের কথা। আজ কাল তো কোরাণ কিতাবের কথা কেউ বলেও না, শোনেও না। সেই সব কিতাবে বলেছে সবর যে করে কপালে তার সুখ, আখেরাতে তার বেহেশত। সেই কিতাবের কথাটা যে একেবারে চোখের সামনেই ফলে গেল। হাতের বের থেকে নবিতুনকে ছেড়ে দিয়ে চোখের পানি মোছে আর বলে গুজাবুড়ি।

যেন কি বলবে কি করবে ভেবে না পেয়ে সাত তাড়াতাড়ি রসপিঠের হাড়িটাই নেয় নবিতুন। কদমের তুলে রাখা পিঠেটার অর্ধেকখানি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খেয়েছিল নবিতুন। বাকি অর্ধেকখানি তুলে শরবতির ছেলেটাকে খেতে দেয় ও। তারপর ভাঙ্গা টুকরো আর রসটুকু খোরায় ঢেলে তুলে দেয় গুজাবুড়ির হাতে। আজ সুখের দিনে গুজাবুড়ির কথাগুলো সত্য সত্য বলেই যেন বিশ্বাস হয় নবিতুনের। সুখের দিনে মনে হয় না গুজা-বুড়ি শয়তান, গুজাবুড়ি লুন্দর শেখের কুটনি মাগী। ব্যাভিচারের দূতী গুজাবুড়ি, সে যেন কবেকার দুঃস্বপ্ন। হাঁড়িটার তলায় পিঠের টুকরা-টাকরি এখনো বুঝি লেগে আছে। হাত গলিয়ে তলানিটাকে আবারও ছেঁচে তুলে আনে নবিতুন। ঢেলে দেয় গুজাবুড়ির খোরায়।

নবিতুন বলেছিল কচুবাটা ঠেঁসে জ্বালিয়ে দেবে গুজাবুড়ির মুখ। সে মুখে নিজের পান্হাটা তুলে দিয়েছিল নবিতুন। সে মুখে আজ মিষ্টির রস ঢেলে দিল নবিতুন। চোখ বড় বড় করে চেয়ে থাকে শরবতি।

পরম তৃপ্তি ভরে মিষ্টি রসটা ঢোকে গিলে নেয় গুজাবুড়ি। তারপর জিভ দিয়ে খোরাটাকে চেটেপুটে খায় বার বার। জিভের লালা দেখে বুঝি এক তৃপ্তি আর আনন্দ ভরা চোখে চেয়ে থাকে নবিতুন।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১২

একটি লতা, আষ্টেপৃষ্ঠে আঁকড়ে থাকে গাছটাকে—নবিতুন বুঝি এক লতা। আঁকড়ে থাকে, আগলে রাখে কদমকে।

দিনগুলোও কেমন ফুর ফুর করে চলে যায়। নবিতুনের মনে হয় বড় তাড়াতাড়ি কাটে দিন। আর দিন যত ফুরোয় উদ্বেগ বুঝি বেড়ে যায় নবিতুনের। নবিতুনের লতার বাঁধনটা আরো শক্ত করে ঘিরে রাখে কদমকে।

প্রথমেই ঘরের কাজে হাত দিয়েছে কদম। নতুন চাল তুলেছে। চালের উপর নতুন ছন বিছিয়েছে। ঘুণে খাওয়া পালাগুলো পাল্টিয়ে নতুন পালা লাগিয়েছে। পাকা বাঁশের বেড়া। দশ বছরেও তার কিচ্ছু হবার কথা নয়। তবু এখানে সেখানে দু'চারটি মেরামত লাগে। মেরামত করে আর তাজ্জব বনে যায় কদম। পাঁচটি বছরে একবারও কি ঘরটি মেরামত করার দরকার মনে করেনি নবিতুন? ভাগ্যিস একেবারে ঠেঁসে চারপাঁচ আস্তর ছন লাগিয়ে গেছিল কদম। নইলে এমনি ছাউনি তো দু বছরের বেশী টেকে না।

নিজের কাজকর্মগুলো সেরে নবিতুনও আসে। ছুঁড়ে দেয় ছনের গোছা, বেতের আঁটি, এগিয়ে দেয় দাটা, কঞ্চিটা।

হ্যাঁরে নবিতুন। তোর বুদ্ধিশুদ্ধি আমার চেয়ে বেশী বলেই তো জানতাম। চালের উপর থেকে নাবতে নাবতে বলে কদম।

বুঝতে না পেরে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে নবিতুন।

চালগুলো সব পঁচে ঝুর ঝুর করছে। ঘুণে খেয়ে পালাগুলো ঝাঁঝরা হয়ে রয়েছে। মাটির তলায় গোড়াগুলো গেছে পঁচে। এ ঘর তো যে কোনদিন ভেংগে পড়তে পারত তোর মাথায়? ছেনি দিয়ে বেতের বুকটা আলগা করে আর বলে কদম।

নবিতুন একটা বেত দুফার করেএগিয়ে দেয় ওর দিকে।

ঘরটা মেরামত করিসনি কেন রে? হঠাৎ শুধায় কদম।

কিছুই বলে না নবিতুন।

ওকে নিরুত্তর দেখে মুখ তুলে তাকায় কদম। একটা গোটা বেতের মুখ দা'য় বুকে রেখে আস্তে আস্তে ঠেলে চলেছে নবিতুন। বেতটা দু'ফার হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে দু'দিকে। কাজে বুঝি গভীর মনোযোগ নবিতুনের।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছুক্ষণ ওর নির্বিষ্ট মুখটাকে দেখল কদম। বলল, এত টাকা পাঠালাম, আসল কামটাই করাসনি তুই ?

আয় আয় কুক কুক তি তি তি। হাতের কাজটা ফেলে মোরগগুলোকে ডাকতে উঠে যায় নবিতুন। মোরগগুলোকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

কেমন ধন্দ লেগে যায় কদমের। টাকারই যদি কমতি পড়ত তবে লিখে জানায়নি কেন নবিতুন ? এসব নিয়ে আরো দু'একদিন আলাপের চেষ্টা করেছে কদম। আজকের মতোই অন্য কাজের বাহানায় নিরুত্তরে উঠে গেছে নবিতুন।

এও এক ধন্দ—কদমের একটা চিঠিও পায়নি নবিতুন। এমন হয়নি কোনবার। এবার কেমন করে হল ভেবে পায় না কদম। পোস্টমাস্টারকে শুধিয়ে ছিল কদম। মুখের ভ্যাংচি কেটে উল্টো শুধিয়ে ছিল পোস্ট-মাস্টার, মিঞা, ঠিকানা ঠিক লিখেছিলে তো ?

আমার বাড়ীর ঠিকানা, আপনার বরাবর। তাতে ভুল হবে ? বলেছিল কদম।

ঠিক বাক্সে ফেলেছিলে তো ? আবারও শুধিয়েছিল পোস্টমাস্টার। পোস্টমাস্টারের বে-আক্কুলে কথায় চটে গিয়েছিল কদম। চটে গিয়ে বলেছিল, এত বছর বিদেশ করলাম, পোস্টবাক্স চিনব না ?

তবে চিঠি আসবে না কেন ?

আলবত এসেছে। তোমার মাগটারে শুধিয়েছ ? সে কি কয় ?

সে তো কয় না কিছু। তবে চিঠি পায়নি, এটা বোঝা যায়।

ও, কয় না কিছু, তাই না ? চোখটাকে কি এক বাঁকা ঠারে নাচিয়ে নেয় আর হাসিটাকে ঠোঁটের বাঁকা রেখায় কেমন করে ধরে রাখে পোস্ট-মাস্টার। আচমকা গায়ে যেন কাঁটা ফোটে কদমের।

কথা না বাড়িয়ে চলে এসেছিল কদম। গেছিল লুন্দর শেখের সাথে দেখা করতে।

এলি অনেক দিন পর আরাম টারাম করে নে। তারপর ধীরে সুস্থে সব কথাই হবে। সালামালেক, পান তামাকের পর বলেছিল লুন্দর শেখ। কী সব কথা ? ধন্দ লেগে গেছিল কদমের। পোস্টমাস্টারের চোখের বাঁকা ঠার যেন লুন্দর শেখের মুখেও।

'কী সব কথার পর' টাকার কথা, চিঠির কথা শুধায়নি কদম। উঠে আসবার সময় বলেছিল লুন্দর শেখ, যাচ্ছে শহরের মামলার তদবিরে। মাসেক বোধ হয় থাকতে হবে। ফিরে এসে হবে সব কথা। আর বলেছিল,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বৌটার উপর একটু নজর রাখিস।

নজর? নবিতুনের উপর নজর রাখবে কদম? কদমের মনে হয়েছিল ওর মাথার ভেতরে কী যেন এক হুলস্থুল কাণ্ড ঘটে চলেছিল সেদিন।

লুন্দর শেখের 'কী সব কথার' আভাস, পোস্টমাস্টারের বাঁকা ঠারের 'হুম', কদমের মনের ধন্দটা শুধু বাড়িয়ে দেয়। কি যেন ঘোঁট পাকিয়ে উঠেছে চারিদিকে। ঠিক ঠিক বুঝতে পারছে না কদম।

নবিতুনকেই শুধায় কদম। হ্যাঁরে বৌ, আমার চিঠি না হয় পাসনি তুই, তা বলে তুই চিঠি দিলি না কেন?

নারকেল কোরাচ্ছিল নবিতুন। কোরানির আগার দিকেই চোখজোড়া নিবদ্ধ ওর। সারেংয়ের কথাটা শুনে চমকে গেল। ওর আনত মুখটা আরো ঝুঁকে গেল কোরানির দিকে। কিছুই বলে না নবিতুন।

নবিতুন ভাবে, কেন এমন নিষ্ঠুর ঠাট্টা করে লোকটা?

স্থির নজরে ওকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে কদম। জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে যেমন করে দেখতো সাগরটাকে। হঠাৎ কি যেন মনে করে মনে মনেই হেসে উঠে কদম। নরম স্বরে শুধায় আবার, আমার চিঠি না পেয়ে গোসা করেছিলি বুঝি? এবারও নীরব নবিতুন।

কদমের মনে হল চোখজোড়া যেন তুলতুলিয়ে এসেছে নবিতুনের! একটু পরেই অবশিষ্ট নারকেল মালাটা আর কোরানিটা হাতে লয়ে চলে গেল নবিতুন।

কী এক অভিমাতে ভার ভার নবিতুনের চলা। পেছন থেকে মনে হয়, একটু যেন মোটাও হচ্ছে ও। ওর সেই ভারি ভারি পা চলার দিকে তাকিয়ে হাসিও পেল কদমের। এত রাগও করতে জানে নবিতুন? গোসা করে এতটা বছর চিঠি দেয়নি ওকে?

কিন্তু ধন্দটা যায় না কদমের মন থেকে। ধন্দটা যেন ক্রমেই ঘোঁট পাকিয়ে তুলছে মনের ভেতর।

ধন্দটা কেবলি ঘোঁট পাকায় কেননা অনেকের অনেক নেপথ্য কথা কানে এসে ধাক্কা খায়। 'সব কথা' যা বলেনি লুন্দর শেখ কোটনা-কুটনীর চোখের ঠারে বাঁকা হাসিতেই ইঙ্গিতময় হয়ে উঠে সে 'সব কথাই'। ধন্দটা কেবলি ঘোঁট পাকায়, কেননা নবিতুন রেগে ওঠে না, প্রতিবাদ করে না। নবিতুন নীরব।

একদিন রেগে গেল কদম। রেগেমেগেই বলল, 'মাইনষে' যে এত কথা কয় কানে যায় না তোর। তুই কি বয়রা?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিরুত্তর নবিতুন। 'মাইনষে' কি বলে না বলে ওতে যেন কিছুই আসে যায় না ওর। পাটি পাতা রং মুখের কাজল-রং দুটো চোখ। চকিতে বুলিয়ে যায় কদমের মুখটা। যেন শুধায়—তুমি কী বল? তারপর চলে যায় নিজের কাজে।

ধন্দটা বুঝি কেবলি ঘোঁট পাকিয়ে যায় কদমের মনের ভেতর।

হাঁস মুরগির ময়লা সাফ করতে করতে ভাবে নবিতুন, সাগর পারের সেই বিদেশিনীরা এবার সত্যি সত্যিই 'তুক' করেছে ওর সারেংকে। নইনে একি নিষ্ঠুর তামাসা সারেংয়ের? অথবা সাগরের পানিতে এবার কান্ডজ্ঞানটাই বুঝি ভাসিয়ে দিয়ে এসেছে লোকটা।

ছিলে নেয়া বেতগুলো আঁটি করে বাঁধল কদম। আঁটিগুলো সরিয়ে রেখে ডাকল আক্কিকে, আক্কি তোর মাকে বল আমি গোসল করতে চললাম। গোসল সেরে খেতে বসল কদম। খেতে বসে সেই বদনা আর সেই বর্তনগুলোর কথাই আবার মনে পড়ে কদমের।

বাড়ী এসে প্রথম প্রথম কিছুই লক্ষ্য করেনি কদম। ক্রমেই ওর মনে হতে লাগল কি যেন নেই যা ছিল। নেই পেতলের বদনাটা। নেই ওর সখের কেনা এক জোড়া চিনামাটির বর্তন। নেই এনামেলের বাটিটা। ঘিয়ে রংয়ের গামলাটাও নেই।

এক একবার বিদেশ করে ফেরার সময় এক একটা জিনিস নিয়ে আসত কদম। এমনি করে এই সখের সম্পত্তি জমেছিল ওর। সেই সখের জিনিসগুলো না দেখে ক্ষুব্ধ হয়, তাজ্জব হয় কদম।

বাড়ীতে কি চোর ঢুকেছিল? শুধায় কদম।

আল্লায় না করুক, চোর ঢুকতে যাবে কেন? বলল নবিতুন।

তবে জিনিসগুলো কোথায়?

প্রশ্নটার জবাব না দিয়ে নবিতুন আর এক করসুল সালন তুলে দেয় কদমের পাতে।

কেন জিনিসগুলোর কথা বলছে বাপজান সেটা ধরে উঠতে বোধ হয় একটু সময় লাগে আক্কির। ধরতে পেরে পাশ থেকে চেঁচিয়ে ওঠে, ওমা, ওগুলো যে বিক্রি করেছে। চৌধুরীবাড়ী.....কথাটা শেষ করতে পারে না আক্কি। দাঁত কটমটিয়ে চোখ পাকিয়ে তাকাচ্ছে নবিতুন।

বিক্রি? কেনরে? আক্কির কাছ থেকেই যেন উত্তরটা চায় কদম। মায়ের মেয়ে আক্কি। বাপের প্রশ্ন গ্রাহ্যেই আনে না ও।

পাতের ভাতটা নীরবে শেষ করে উঠে যায় কদম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুধু ঘোঁট পাকিয়ে চলেছে মনের ধন্দ। কোন সীমাংসা পায় না কদম। সাগরের কোলে ফেরার দিনটাও বুঝি এগিয়ে আসছে কদমের। আর কঠিন হচ্ছে নবিতুনের পাটিপাতা চিকন হাতের বাঁধনটা। ওকে আগলে রাখে নবিতুন, চোখের বাইরে যেতে দেয় না।

সাগরের মানুষ কদম। ডাংগার মানুষের মতো হুট করে কিছু করে না, ফস করে রাগে না। মনের ধন্দটাকে নাড়াচাড়া করে মনের ভেতর।

নানাজান ডাকে, মিয়া যে একেবারে বৌর মধুতে ডুবে রইলে? আস না পান তামাকটা খেয়ে যাও। যাবে বলেও যায় না কদম। নবিতুনের নরম লতার বাঁধনটা ছিঁড়ে ঘরের বাইরে যেতে ইচ্ছে করে না ওর।

কিন্তু ঘরের ভেতরেও যে অনেক কথা কানে এসে লাগে। কিছু আসে বাতাসে ভেসে। কিছু আসে কানে কানে ফিসফিসিয়ে। এ কান দিয়ে শোনে কদম, বের করে দেয় ওকান দিয়ে। তবু সব কথাই কি বেরিয়ে যায়? অনেক কথাই যে গেঁথে থাকে বুকের ভেতর।

হুট করে কিছু করে না কদম; ফস করে রাগে না—সবই সত্য। কিন্তু বুকের ভেতর কি যেন পাক খেয়ে ওঠে। পাক খেয়ে সারা গায়ে ছড়িয়ে পড়ে ছাইয়ের তুলার আগুনের মতো।

ছেলেটার হাত ধরে হাসতে হাসতে আসে শরবতি। নবিতুনের সুখে যেন ওরই সুখ। হাসিটাকে পড়তে দেয় না ঠোঁট থেকে।

এত হাস কেন? শুধায় নবিতুন।

হাসি তোমার রঙ দেখে।

শরমে মাটির সাথে মিইয়ে যায় নবিতুন। নবিতুনের সাজগোজ, পাওডার স্নো-গন্ধতেল—এসব নিয়েই বুঝি ওকে লজ্জা দিচ্ছে শরবতি।

কিন্তু, না, শরবতি ওদিক দিয়েই গেল না। শরবতি বলেছে, বলি লোকটাকে কি গুন করলে। নাকি তাবিজ টাবিজ নিলে। লোকটা যে ঘর থেকেই বের হয় না।

খুশী হয়ে ওর পিঠে দুম করে একটা কিল বসিয়ে দেয় নবিতুন।

নাগো বুয়া, ঠাট্টা নয়। তুমি একটা তাবিজ নাও, ওকেও একটা দাও। আর কতকাল বিদেশে ঘুরবে? এবার বেশ ভারিক্কি হল শরবতি। শরবতির কথায় নবিতুনের মনে চাপা দেওয়া উদ্বেগটাই বুঝি খচ করে 'ঘাই' মারে। যতই দিন ফুরাচ্ছে ততই তো ঘনিয়ে আসছে সারেংয়ের যাবার দিনটি।

এক ফকির আছে আমার শ্বশুরবাড়ীর কাছে। বড় নাম ডাক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাবিজ তার মোক্ষম। বল তো আনিয়ে দেই একজোড়া। নির্দিষ্ট একটা প্রস্তাবই দিয়ে ফেলল শরবতি।

শুনি না শুনি করে গেল নবিতুন। সারেংয়ের যাবার প্রসংগটা উঠলেই মুখ দিয়ে কথা সরে না ওর। অনেকগুলো সিংগি মাছের কাঁটা যেন 'ঘাই' মেরে চলে বুকের ভেতর। ব্যথায় কুঁকিয়ে ওঠে বুকটা। রসুই ঘরও বটে ঢেঁকি ঘরও বটে—বড় ঘরের সেই অংশটা ওটাকে আলাদা করেছে কদম। পৃথক ভিটিতে নতুন চাল তুলে নতুন ঘর বানিয়েছে ও। বড় ঘর হল শোবার ঘর, থাকার ঘর। তার আলাদা ইজ্জত। কাজ কামের ঘর সে থাকবে পৃথক। একটু দূরে। সেটাও একটা ইজ্জত। দেখতেও সুন্দর। দুটো ঘরই পাশা পাশি। ব্যবস্থাটা পছন্দ হয়েছে নবিতুনের। বড় হিস্যার কাছে ওর মুখটা আর ছোট হয়ে থাকবে না।

নতুন ঘরটার বেড়া বাঁধছে কদম। কদম ঘরের ভেতর। বাইরে ফুটো দেখে দেখে বেতের মুগুগুলো ঘুরিয়ে দিচ্ছে আক্কি।

দুটো ঘর হল। বেশ হল, না ? নবিতুনের দিকে মুখটা ফিরিয়ে বলল কদম।

ঘর লেপছে নবিতুন। মুখটা না তুলেই সংক্ষেপে বলল, হুঁ।

বেড়ার ওপারে আক্কি ভাবল কথাটা বুঝি তার উদ্দেশ্য ! ও বলল, খুব ভাল হয়েছে বাবা। বুচি খালি খোঁটা দিত আমায়।

বুচি বড় হিস্যার শরবতির ভাই-ঝি।

এবার হল দুটো। পরের বার হবে তিনটি। গাই কিনে দেব তোকে। তার জন্য একটা গোয়াল ঘর লাগবে না ? নবিতুন যদি কিছু বলে সে জন্য একটু থামল কদম। থেমে বেত বাঁধতে বাঁধতে আড় চোখে একবার তাকাল ওর দিকে।

নবিতুন কিছু বলে না। একমনে ভেজা ন্যাতাটা বুলিয়ে চলেছে মাটির ওপর।

তার পরের বার যখন আসব তখন তুলব আর একটি ঘর। মোট হবে চারটে। বেশ হবে। কথার ভেতর খুশি ঢেলে দিল কদম।

না ! নবিতুনের মুখ দিয়ে যেন আচমকা একটা বাজি ফুটে গেল।

না কেনরে ? অবাক হয়েই শুধায় কদম।

কেন'র কোন জবাব দেয় না নবিতুন। আঙ্গুল দিয়ে মাটির দলাগুলো ভাঙ্গে। পানির ছিঁটা দেয়। কাদা মাটিটা সমান করে লেপে দেয় ভিটির গায়ে। তারপর ভেজা ন্যাতাটা জোরে টেনে চলে। ওর হাতের স্পর্শে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুন্দর মসৃণ হয়ে উঠে লেপা মাটির মুখটা।

মা, মা, তুমি আস এবার। বেড়ার উল্টো দিকে থেকে ট্যাঁ ট্যাঁ করেছে আক্‌কি। সেই কখন থেকে বেঁত এগিয়ে দিচ্ছে, বেড়াটাকেই ঠেলে রাখছে, বাঁশের লম্বা লম্বা কঞ্চিগুলোকে হাত দিয়ে চেপে রাখতে হচ্ছে ওকে। বুঝি ক্লান্ত হয়ে পড়েছে আক্‌কি।

এই বেড়াটাকে চেপে ধর। ঘরের ভেতর থেকে বলল কদম।

দু হাতের ঠেলা দিয়ে বেড়াটাকে চেপে রাখল আক্‌কি।

পাল্লার উপর পা রেখে মাথাটাকে পেছনে হেলিয়ে যতটা জোরে সম্ভব বেঁতের দু'দিকের আগা ধরে টান দিল কদম। কাঁক্‌কড় করে বাঁকিয়ে গেল তরজার বেড়াটা। ঠুস করে ছিঁড়ে গেল বেতটা।

ধুস শালা। পিছন দিকে পড়তে পড়তে সামলে নেয় কদম।

বেড়ার ওদিকে হাসি চাপতে গিয়ে কুক কিক্‌ কুক কিক্‌ বিচিত্র সব শব্দ বেরিয়ে আসে আক্‌কির গলা দিয়ে।

কিরে হাসিস কেন ? এদিক থেকে শুধায় কদম।

শালা কাকে বললে বাবা ? এবার আর হাসিটা চেপে রাখতে পারে না আক্‌কি।

তোর মামাকে। বলে কদম। তারপর বাপ-ঝিয়ে গলা মিলিয়ে হাসে। বাপেঝিয়ের হাসিতে যোগ দেয় না নবিতুন। নবিতুন চুপ। ঘর লেপা ন্যাতা আর অবশিষ্ট মাটিটুকু বাইরে রেখে এল ও। আড় চোখে নবিতুনের গম্ভীর মুখখানা একবার দেখে নিল কদম। আক্‌কির সাথেই কথাটা জারি রাখল কদম। জানিস মা ? আমাদের চারখানি ঘর উঠুক তোর মার সেটা একটুও পছন্দ নয় !

কোন্‌ পক্ষে থাকা উচিৎ বুঝতে না পেরে আক্‌কি সংক্ষেপে বলে, হিঁ। ডাকে মাকে, আমি আর পারি না, আস না মা ?

চার ঘর দিয়ে কামটা কি, শুনি ? এক ঘর, তাতেই বা থাকে কে ? ঘর তোলারও দরকার নেই, বিদেশ গিয়েও কোন কাম নেই। হঠাৎ বাঁশ-চোরা আওয়াজ তুলে যায় নবিতুনের গলাটা।

কেমন যেন ফুঁসে ফুঁসে উঠেছে নবিতুন। কাঁপছে ওর মুখের পেশী-গুলো। চোখ বয়ে এখনি যেন ঢল নামবে। তাজ্জব চোখ করে ওকে দেখে কদম। এমন বিস্ফারিত অভিমানে নবিতুনকে কখনও দেখেনি ও।

তার চেয়ে এক কানি জমি কেন। স্বরটাকে এতক্ষণে শান্ত করে নবিতুন। এবারই আসল কথাটা শুনে হেসে দেয় কদম। জমি আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গেরস্তির সেই পুরানো নেশা নবিতুনের। জমির টান দিয়ে ও বেঁধে রাখতে চায় কদমকে। গেরস্তির নেশা দিয়ে ভুলিয়ে রাখতে চায় কদমের সমুদ্রের নেশাটা।

ধুৎ। বছর বছর নগদা আয় ফেলে জমিতে কে যায় রে? জমি কি আর আগের জমি আছে। জমি এখন বাঁজা গাছ। ওতে লাভ নেই। সব সময় যে উত্তরটা দেয় কদম, আজও তাই দিল।

মেয়েটাকে এবার ছাড় না? সেই কখন থেকে ট্যাঁ ট্যাঁ করছে। জমির কথাটা আর বাড়াল না নবিতুন। জমির কথাটা নিয়ে বেশী টানাটানি করলে কেমন একরোখা হয়ে যায় সারেং। বরাবরই লক্ষ্য করেছে নবিতুন। আর একরোখা সারেংকে বড় ডর ওর।

বেশ, তুই আয়। যারে আক্‌কি যা। ছুটি পেয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চলে আক্‌কি। নবিতুন এসে এগিয়ে দেয় বেতের মাথা।

একটার পর একটা বান বেঁধে যায় কদম। পালার সাথে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে যায় নতুন বেড়া। কদম বেরিয়ে আসে দাওয়ায়।

তোমার সাথে কথা ছিল একটা। অনেকক্ষণ পর বলল নবিতুন।

হাতের ছেনিটা মাটিতে রেখে উন্মুখ হল কদম। উন্মুখ ওর সব কয়টি ইন্দ্রিয়। খাড়া হল ওর চোখ, ওর কান। বলল কদম, বল বল নবিতুন। আমি যে তোর মুখ দিয়েই শুনতে চাই। বল তুই।

বলল নবিতুন। কিন্তু কদম যে কথা শোনার জন্য উদগ্রীব সে কথা নয়, অন্য কথা। নবিতুন বলল, মেয়েটা যে বিয়ের লায়েক হল!

ও, এই কথা? কদম যেন ধপ করে বসে পড়ল।

কী যে কাণ্ড তোমার। কথাটা একদম গায়ে মাখলে না। আমি বলছি, মেয়ের বিয়ে না দিয়ে এবার তোমার বিদেশ যাওয়া হবে না। বেশ জোর নবিতুনের কথায়।

কদম ভাবে ওকে দুটো দিন বেশী আটকে রাখবার এও এক ফন্দি নবিতুনের। মুখে বলে, এত জলদির কিরে?

লোকটা হিসেব টিসেব কিছুই রাখে না? নবিতুনের বুঝি রাগ ধরে যায়। নবিতুন বলে, জলদি কি বলছ গো? এগারো পেরিয়ে বারোয়-পা দিতে চলেছে মেয়ে। কদম কি যেন ভাবল। বেতের টুকরা টাকরি চেরা বাঁশের আগাছার মতো হাবি-জাবিগুলো সরিয়ে ফেলে দিল বাইরে। তারপর একটা পিঁড়ি টেনে জুত হয়ে বসল কদম। বলল, মেয়েটাকেও পাঠিয়ে দিবি পরের বাড়ী। আমিও চলে যাব। কষ্ট হবে না তোর?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কদমের মুখেও যাবার কথা? এত সকালে? মুখটা ঘুরিয়ে নেয় নবিতুন। বুকের ভেতর সেই সিংগি মাছির কাটার ঘাই। সেই খচখচে যন্ত্রণা।

কিছুটা সময় চলে যায় চুপচাপ। ছেনিটা লয়ে অকারণেই একটা মাটির ঢেলা কুপিয়ে চলে কদম। সরু এক ফালি বেত আংগুলে প্যাঁচায় নবিতুন। নবিতুনই ওর নীরবতাটা ভাংগল। আস্তে আস্তে বলল, শরবতি বলছিল ওর চাচাতো দেওরের কথা। ঘর গেরস্তি ভালই। দু'ভাই এক শরিক। জমি আছে চার কানি, তুমি কি বল? আমি বলি হলে সম্বন্ধটা খুবই.....।

থেমে যায় নবিতুন। আক্কি এসে পড়েছে দাওয়ায়। বেতুন পাকাচ্ছে আক্কি। বেতুন ভর্তি বাসনটাকে আর একটা বাসন দিয়ে ঢেকে ঝুকুর ঝুক ঝাঁকিয়ে চলেছে আর ছড়া বলছে ও ঃ

আম পাকে জাম পাকে
মামা বাড়ির বেতুন পাকে।

হো হো করে হেসে দেয় কদম। দেখ দেখ তোমার মেয়ের কান্ড। মামা দেখলে না জীবনে, কিন্তু মামা বাড়ীর বেতুন পাকিয়ে চলেছে।

বাপের হাসিতে যেন উৎসাহটা বেড়ে যায় আক্কির। আরো জোরে ঝাঁকুনী দেয় ও, ঝুকুর ঝুক ঝুকুর ঝুক। আর ছড়া বলে ঃ

আমি ভাল জাম ভাল
তেঁতুল বড় টক
বাপের বাড়ী হাত গেল পিঠ গেল
মামা বাড়ীর পিঠায় বড় ঢক।

ঝুক ঝুক ঝুকুর ঝুক।

শুনছ, বাপের বাড়ীর কেমন বদনাম করছে মেয়েটা? হাত পিঠ সবই নাকি গেল মেয়ের। এবার বিদায় দাও। কদমের দিকে তাকিয়ে বলে নবিতুন। আর আক্কির দিকে চেয়ে হাসে মিষ্টি মিষ্টি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৩

সাগরের ডাকে আবার বুঝি চঞ্চল কদম।

কদম বলে, এবার যেতে হয়রে। জিনিসগুলো গুছিয়ে দে।

নবিতুনের মনে হয়, ধড়াস করে কলজেটাই যেন খসে পড়ল ওর বুক থেকে। কদমের দিকে চোখটা তুলেই নাবিয়ে নিল নবিতুন।

চাটাই বুনছে ওরা। এক পাশে কদম। অন্য পাশে নবিতুন। চটপট আঙ্গুল চলছিল নবিতুনের। হঠাৎ আঙ্গুলের নাচনটা ওর থেমে গেল। বেলোয়ারি চুড়ির ঝংকারটাও।

কিন্তু সেটা মুহূর্তের জন্যে। আবার ওর আঙ্গুল নাচে। বেলোয়ারি চুড়ি বোল ছাড়ে টুনুকি ঝুনুকি। বিকেলের এক চিলতে রোদ পড়ে চিকিমিকি খেলে নকল সোনার রুলি। নবিতুনের আঙ্গুল তো নাচে না, চেরা বেতের মতো পাতলা আর সরু সরু করে কাটা পাটি পাতার ছিলকেগুলোকে নিয়ে যেন ঝড় তোলে নবিতুনের আঙ্গুল।

চেরা চেরা পাটিপাতা বেত। চিকন কালো গাঢ় সবুজ ওদের গা। নবিতুনের আঙ্গুলের ছোঁয়া প্রজাপতির ডানার মতো ফরফর বাতাসে কেটে যায় ওরা। সিদা সিদা। আড়াআড়ি। ঘরের পর ঘর পড়ে। হেসে ওঠে চাটাইর মসৃণ বুনোট।

কাছেই বসে আছে আক্কি। ছেনি দিয়ে চিকন চিকন করে কেটে গুছিয়ে রাখছে পাটিপাতা বেত। হাত বাড়িয়ে দুটো গোছা টেনে নিয়ে আবার আঙ্গুল চালায় নবিতুন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও পাশে পিছিয়ে পড়ে কদম।

আচ্ছা 'ধীরুয়া' তুমি। ধমক ছাড়ে নবিতুন। তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে বেতের ধারাল কিনারে আঙ্গুল কাটে কদম। বুঝি রক্তও ঝরে একটু। তবু নবিতুনের সাথে তাল রাখতে চেষ্টা করে কদম। আড় চোখে তাকায় নবিতুনের দিকে। ওর যাবার কথাটা গায়েই মাখবে না, এটাই যেন ঠিক করে নিয়েছে নবিতুন।

কামাই করে যা এনেছিলাম সে তো ফুরোতে চলল। এবার যে যেতে হয়। আবারও বলল কদম।

কেন, কেন যেতে হবে শুনি ? দেশে গেরামে কি কামাই নেই ? এবার ঝাঁঝিয়ে উঠল নবিতুন।

কদম জানে এর পরই আসবে জমির কথা, গেরস্তির কথা। কদম বলবে, হাতে যা রয়েছে তাতে কি আর জমি কেনা যাবে। সামনেরবার না হয় দেখা যাবে। নবিতুন বলবে, বর্গা নাও, ক্ষেতের কাম কর। কদম বলবে, আমার সয়না। নবিতুন বলবে না সইলে থাক ক্ষেতের কাম। রোজ একখানা করে চাটাই বুনবো আমি। পাটি বুনবো, হাটে হাটে বেচে আসবে তুমি। লা-জবাব হওয়া ছাড়া তখন উপায় থাকবে না কদমের। এত কথার ভেতর না গিয়ে যেন একটু শক্ত হল কদম। বলল, দেখ আট মাস হয়ে গেল। আর থাকা যায় না। এই 'চান্দের' বাকী আর তিনটে দিন। সামনের পয়লা চান্দেই রওনা দেব। কদম বুঝি সিদ্ধান্তটাই জানিয়ে দিল নবিতুনকে।

আবারও বুঝি টিপ করে ওঠে নবিতুনের বুকটা। উঠে দাঁড়ায় নবিতুন। ওর দিকের বুনুনিটা শেষ, কদম এখনও দুহাত পিছিয়ে।

চোখ কি নেই তোমার ? কিছুই কি দেখ না ? স্বরটা কেমন ভেজা নবিতুনের। গলাটা বড় ভার।

কিছুই কি দেখ না ? চোখ কি নেই তোমার ? যেন কদমকে দেখাবার জন্য কদমের চোখের সুমুখে নিজেকে তুলে ধরল নবিতুন। নিজেকে মেলে ধরল।

কদম দেখল, একটু যেন অবাক হয়েই দেখল। তারপর নিচু করে নিল মাথাটা। বলল আচ্ছা, তদ্দিন থাকব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুহূর্তে রাগ ক্ষোভ অভিমান সবই যেন গলে গেল নবিতুনের। ফিক করে হেসে দিল, খুশী আর সোহাগের সময় হাসে ও।

কদমও হাসে আর চেয়ে থাকে নবিতুনের দিকে কেমন বোকার মতো। আস্তে করে ওকে ঠেলে দিয়ে ওর জায়গাটিতে বসে পড়ে নবিতুন। পাটি-পাতা বেতের গোছাটা তুলে নেয় হাতে।

এবার ছেলে হবে, আমি বলে রাখলাম। সরে গিয়ে বলল কদম।

ছিঃ। লজ্জায় বুঝি ঘোমটা টানে নবিতুন। দাঁত কিরমির করে শাসায় কদমকে, এক হাত দূরে যে বসে আছে মেয়েটা, সে কি চোখে পড়ে না কদমের? জিব কেটে আর একটু সরে যায় কদম। মাটিতে বসে বসে দেখে নবিতুনের হাতের কারিগরি, আঙ্গুলের খেলা।

ছেলের মুখ দেখবে বলে যাবার দিনটা পিছিয়ে দেয় কদম।

নবিতুন চাটাই বোনে। হাটে গিয়ে বেচে আসে কদম। চাটাই-য়ের দাম আছে বাজারে। মাঝারি রকমের—দুটাকা আড়াই টাকা। ভাল-গুলো, তিন সাড়ে তিন। সময় সময় চার টাকাতেও ওঠে।

রোজগারের টাকা হাতে থাকলে খরচ হয়ে যাবে বলে ধান কিনেছে কদম। দুজনে মিলে সে ধান ভেনে চালগুলো মটকায় তুলে রেখেছে।

হিসেব-টিসেব করে কদম বলেছে, এদিক সেদিক দিয়ে থুয়েও তোদের মায়ে ঝিয়ে পাঁচ মাসের খোরাক। আমি যাবার আগে এক মুঠ চালও ছুঁবি না ওখান থেকে।

ঘাড় নেড়ে নবিতুন বলছে, হ্যাঁ।

কিন্তু, কদমের সেই মনের ধন্দটা। তার যে এখনো নিষ্পত্তি হল না। ভেতরটা যে এখনো পাক খেয়ে ওঠে।

পাটি বেচতে হাটে যায় কদম। পিয়ালগাছার বাজারে গিয়ে এক সময় গল্প জমাতে হয়, কখনো বা পিটিয়ে আসে দুহাত তাস। আর শোনে অনেক কথা।

সে সব কথার কোনটাই পুরোপুরি নয়, সবটাই আধাআধি। সেই যে লুন্দর শেখ বলেছিল, বৌটার উপর নজর রাখিস, তেমনি।

সে সব কথা খোলাসা নয়, স্পষ্টও নয়। সবই যেন বাঁকা ইঙ্গিত, পোস্টমাস্টারের 'হুম'টার মতো।

এত যে চিঠি লিখল কদম, কোথায় গেল সেসব চিঠি? নবিতুন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চিঠি দিয়েছে, এতেও এখন নিঃসন্দেহ কদম। নবিতুন কিছু বলেনি। কিন্তু আক্কি আর শরবতি, কথায় কথায় ওদের কাছ থেকে জেনেছে কদম—চৌধুরীবাড়ীর ছোট বৌকে দিয়ে কম চিঠি লেখায়নি নবিতুন। কদম কেন পেল না সে সব চিঠি। ঘরের জিনিসগুলোই বা কেন বিক্রি করেছিল নবিতুন? প্রশ্নগুলোর কোন উত্তর খুঁজে পেল না কদম।

এ সবের উপর প্রশ্ন উঠেছে নবিতুনকে নিয়ে।

ধন্দাটা শুধু গিট প্যাঁচায় না, ঘোঁট পাকায় না, ধন্দটা অস্থির করে তুলেছে কদমকে। তাই একটু যে মেল-মজলিস আর বাজারে যেতে শুরু করেছিল ও সেটাও কমিয়ে দিল।

দাওয়ায় বসে থাকে কদম। আর কেমন করে তাকায় নবিতুনের দিকে। কখনো চোখ পাকিয়ে কখনো বিরক্তির সাথে। কদম কথা বলে না আগের মতো। কদম চাটাই বুনতে বসে না নবিতুনের পাশে।

এসব লক্ষ্য করবার সময় কোথায় নবিতুনের। নবিতুন মশগুল যে আসবে যে আসছে ওকে নিয়ে। কদম বলেছে, ছেলে হবে এবার। নবিতুন সেটা বিশ্বাস করে নিয়েছে। ছেলে হলেই যে সুখী ও। আক্কি চলে যাবে পরের বাড়ী। ছেলেকে নিয়ে চমৎকার দিন কাটবে নবিতুনের।

যে আসবে, যে আসছে তার কথাটা ভাবতে গিয়ে খুশীতে ভরে যায় নবিতুনের মনটা। গোটা শরীরময় যেন কথা কয়ে উঠে সেই খুশীটা। এ এমন এক খুশী পৃথিবীর কোন খুশীর সাথেই যার তুলনা হয় না। খুশীর সুমুখে সারেং লোকটা যেন একান্তই গৌণ।

তবু কখনো নজরে পড়ে যায় বৈকি, গালে হাত দিয়ে বসে আছে সারেং। নবিতুন শুধায়, কি হল তোমার?

কদম এমন চোখে তাকায় যার অর্থ—তুই কি কিছুই শুনছিস না, কিছুই দেখিস না? নবিতুনকে যেন ছোঁয়-ই না সে দৃষ্টি। কে কী বলল সেটা শোনার জন্য ভারি বয়ে গেছে ওর, এমনি একটা ভাব করে চলে যায় নবিতুন। আর কদমের মনে সব কিছু গিট প্যাঁচিয়ে ঘোঁট পাকিয়ে অস্থির করে তোলে ওকে। নিজের কাছে আর লুকোতে পারে না কদম, গভীর সন্দেহ বাসা বেঁধেছে ওর মনে।

মাত্র এক মাসের জন্য সদরে গিয়ে পাক্কা ছয় মাস কাবার করে এল লুন্দর শেখ। লুন্দর শেখ বলে, এ কি যে সে মামলা? সদরের লাগ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেই যে ভাটিয়ার টেক ? বছরে যে টেকের মাছ রফতানীর মুনাফা ফেলে ছড়িয়েও দু'লাখ ? সেই টেক নিয়েই তো মামলা। আর মামলাটা কি চুনোপুটির সাথে ? যাকে বলে চন্দনপুরার দেওয়ান, সেই দেওয়ানদের সাথে। তা এবার একেবারে ফয়সালা করে এলাম। এক হাত দেখিয়ে এলাম দেওয়ানদের। তাই তো ফিরতে এত দেরী।

বিরোধী পক্ষ বলে অন্য কথা তারা বলে, আরে মিঞা তোমারাও কি পাগল হলে ? বিশ্বাস কর ওই মিথ্যা বাদীটার কথা ? ব্যাটা বাটপার, ঠগ-বাজ। আজ একে ঠকাচ্ছে কাল ওর মাথা ফাটাচ্ছে। পরশু জবরদখল করছে আর একজনের হক জমি। কত মামলা যে ঝুলে আছে ওর বিরুদ্ধে তার কি কোন হিসেব আছে ? তা বাঁ হাতের কেরামতিতে কদ্দিন আর পার পাওয়া যায় বল ? ছয়টি মাস জেলখানার ঘানি টেনে এসে এখন যত চালবাজি।

চন্দনপুরার দেওয়ানদের একহাত অথবা দুহাত দেখিয়ে আসুক অথবা চিটিংবাজির মামলায় জেলখানার ঘানি টেনে আসুক লুন্দর শেখ, তাতে কদমের কিছু যায় আসে না। লুন্দর শেখ বলছিল, ফিরে এসে হবে সব কথা। সেই 'সব কথা' না শুনে স্থির হতে পারছে না কদম। তাই ছুটে এল ও।

কিন্তু লুন্দর শেখের মুখেও সেই আধাআধি কথা, পুরো কথা নয় একটিও। সেই ছ'মাস আগে সদরে যাবার সময় থেকে ধন্দে ফেলে গেছিল কদমকে। তেমনি সন্দেহ আর ধন্দ জাগাল একটি কথার অংশ, একটি ইঙ্গিত, পোস্টমাস্টারের 'হুম'টার মতো।

প্রথমে একথা সেকথা নানা কথা হল। বিরোধী পক্ষের আদ্যশ্রাদ্ধ করল লুন্দর শেখ। আসল কথাটা তুলবার ফাঁকই পেল না কদম।

হাবিজাবি কথার পর লুন্দর শেখ চটি জুতোর ভেতর পা গলিয়ে দিল। চেয়ার থেকে পা তুলল। অন্দর বাড়ির দিকে পা বাড়াল।

কদমও দাঁড়িয়ে পড়ল। দাঁড়িয়ে যেন মরিয়ে হল। মরিয়া হয়েই বলল, ও মামুজান, কী সব কথা বলবেন বলেছিলেন ? যখন ধনী ছিল-না লুন্দর শেখ, হাল চষত নিজ হাতে, সেই তখন থেকেই লুন্দর শেখ গ্রাম সুবাদে কদমের মামুজান।

ঘাড় ফিরিয়ে কদমকে দেখল লুন্দর শেখ। কদমের মনে হল ওই দেখাটা যেন কেমন আশংকা জাগান ইঙ্গিতভরা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখন তো বড় তাড়া আমার। আসিস আর একদিন। অন্দর মহলের দিকেই রওনা দিল লুন্দর শেখ। কি যেন ভাবল। ভাবতে ভাবতেই থেমে গেল। শুধাল, বৌটার উপর নজর রেখেছিলি তো? বুঝলি কিছু?

কি বুঝবে কদম? ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে কদম।

লুন্দর শেখের ঠোঁটের কিনারে সেই বাঁকা হাসি, চোখের ঠারে সেই বাঁকা ইংগিত, যা কী এক ভয় আশংকা আর সন্দেহ হয়ে শুধু পাক খায় কদমের মনের ভেতর। উত্তরের জন্য অপেক্ষা করে না লুন্দর শেখ। যেতে যেতে বলে, আসিস আর একদিন।

কিছু ভাল লাগে না কদমের। দাওয়ায় বসে গালে হাত রেখে ও শুধু ভাবে কি বলতে চান লুন্দর শেখ। 'সব কথা' শুনে একটু থির হবে বলেই কদম গেছিল লুন্দর শেখের কাছে। কিন্তু মনের ভেতর আরো অনেক সন্দেহ অনেক অস্থিরতা নিয়েই ফিরেছে ও। আর ফিরে সেই অবধি বসে আছে দাওয়ায়।

কতক্ষণ যে বসে আছে সে খেয়াল নেই কদমের। খেয়াল হল যখন তেষ্টায় গলা ওর শুকিয়ে এসেছে। পানি চেয়ে নবিতুনকে ডাকল কদম। সাড়া নেই নবিতুনের।

কদমের মনে হল অনেকক্ষণ ধরেই যেন দেখছে না নবিতুনকে। ঘরের ভেতর উঁকি দিল কদম। ঘরে নেই নবিতুন। হয়তো পাতা কুড়োচ্ছে। তাই ঘরের পেছনে ডাঙ্গার দিকে এল কদম। না, সেখানেও নেই নবিতুন। আক্‌কিটাই বা গেল কোথায়? জোরে জোরে দুবার ডাকল কদম। পাত্তা নেই আক্‌কির। কিন্তু মুখ ঘুরাতেই নবিতুনের পাত্তা পেয়ে গেল ও। সারেংবাড়ীর উত্তরের সীমানায় যে গড় সেই গড় থেকে পাতা মচ-মচিয়ে উঠে আসছে নবিতুন। কদমকে দেখে কি এক লজ্জায় ঘোমটা টেনে দিল নবিতুন। মুখে ওর শরমের আবীর।

হঠাৎ। হঠাৎ মনের যত ধন্দ যেন মিটে গেল। যত প্রশ্ন যত সন্দেহ সবই যেন স্পষ্ট হয়ে গেল, সবই পরিষ্কার হয়ে গেল। কোন সংশয় নেই কদমের। কোথায় গেছিলি? রূঢ় আর কঠিন স্বর কদমের।

প্রশ্নের ধরনটা ভাল লাগল না নবিতুনের। মিনিট খানিক কদমের মুখের দিকে চেয়ে রইল ও। বলল, চৌধুরীবাড়ী।

চৌধুরীবাড়ী? চৌধুরীবাড়ী কেন? কদমের মেজাজটা ক্রমেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চড়ছে। লোকটার এমন মেজাজ কখনো দেখেনি নবিতুন। বুঝি ভয় পেল নবিতুন। আস্তে অতি নিচু স্বরে বলল নবিতুন, ছোটবৌর কাছে।

ছোটবৌর কাছে। কি এক ব্যঙ্গ বিদ্রূপে মুখটাকে লম্বা আর বিকৃত করে উচ্চারণ করল কদম। সুধাল, আবার কেন? ছোটবৌর কাছে কী কাজ তোর?

সুঁচ, একটা সুঁচ আনতে গেছিলাম।

সুঁচ, হাতে ওগুলো আবার কি?

একটু সুতো। আর একটা পুরানো শাড়ী। কী এক কুণ্ঠায় আর লজ্জায় জড়িয়ে জড়িয়ে বলল নবিতুন। হাতের জিনিসগুলো মেলে ধরল কদমের সুমুখে।

এ-সব, এ সব কে দিয়েছে তোকে! কেন, কেন দিয়েছে? উত্তেজনায় এবার হাঁফাচ্ছে কদম।

নবিতুন বুঝি বলতে চায়, কেন তুমি বুঝতে পার না? দেখছ না? রয়েছে ছোটবৌর দেয়া সুঁইসুতো আর কাঁথা সেলাইর জন্য একখানা পুরনো শাড়ী? কিন্তু নবিতুন বলতে পারে না কিছুই। ফ্যাল ফ্যাল অবাক হওয়া আর ব্যথা পাওয়া চোখে শুধু চেয়ে থাকে। সারেংয়ের এমন রাগ কবে দেখেছে মনে করতে পারে না ও।

কাঁথা...বড় নরম স্বরে আর কি এক লজ্জা মিশিয়ে বলতে যাচ্ছিল নবিতুন। কিন্তু ঠোঁটটা ওর নড়ে উঠবার আগেই ছোঁ মেরে জিনিসগুলো ওর হাত থেকে ছিনিয়ে নিল কদম। ছুঁড়ে ফেলে দিল মাটিতে।

নবিতুন থ। কী এক হিংস্রতায় লাল কদমের মুখ। কি এক ক্রোধ গলা আগুনের মতো গলে পড়ছে ওর চোখ দিয়ে। কদমের এমন চোখ এমন মুখ কখনো দেখেনি নবিতুন।

থ মেরে নির্বাক নিস্পন্দ দাঁড়িয়ে রইল নবিতুন। তারপর চোখ নামিয়ে জিনিসগুলো কুড়িয়ে নিল। আস্তে আস্তে চলে এল ঘরের দিকে।

কয়েকদিন পর।

হাট থেকে ফিরে মুখহাত না ধুয়েই বসে পড়ে কদম। পান সুপারির সওদাটা অকারণেই ছুড়ে দেয় চৌকির দিকে। মাটিতে পড়ে যায় পানের বিড়াটা।

খড়ম আর ওজুর পানিটা নিয়ে দরজার মুখে দাঁড়িয়ে থাকে নবিতুন। কদম আসে না। কদম ওকে ডাকে ঘরের ভেতর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থমথমে কদমের মুখ। সে মুখের দিকে তাকিয়ে অজানা এক ভয়ে বুকটা কেঁপে ওঠে নবিতুনের।

তুই নাকি চৌধুরীবাড়ী বান্দীর কাম করেছিস ? রাত কাটিয়েছিস ? জিজ্ঞেস করল কদম।

হ্যাঁ বাবা। কী বজ্জাত চৌধুরী বুড়িটা। সারাটা দিন খাটিয়ে খাটিয়ে মারত মাকে। মা.....

এই চুপ কর।

বাপজানের প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশটুকু বোধহয় শোনেনি আক্কি। প্রথম অংশটারই জবাব দিচ্ছিল। কিন্তু মায়ের ধমক খেয়ে চুপ করে যায় আক্কি।

তা হলে আমার নাম-কাম মান-সম্মান সব ডুবিয়ে দিয়ে বান্দীগিরি করেছিস তুই ? কেন ?

কেনর বুঝি উত্তর নেই। নবিতুন চুপ।

আর কি করেছিস ? বল, শিগগীর বল। দাঁড়িয়ে পড়ে কদম। সমুদ্রের মানুষটা ভীষণ মূর্তি সমুদ্রের মতোই ফুঁসে উঠেছে, গর্জে উঠেছে।

বুঝি সামলে নেয় কদম। বসে পড়ে আবার।

দরজার গোড়ায় ঠায় দাঁড়িয়ে আছে নবিতুন।

এতই যখন দেমাক তোর, ছুঁড়ে ফেলে দিস আমার টাকা, তা আমার বাপদাদার নামে কলংক না দিয়ে চৌধুরীবাড়ী উঠে গেলেই পারিস ? সামলে নিয়ে বুঝি আরো হিংস্র হল কদম।

টা—কা ? শুকনো গলায় শুধু একটা ফাঁটা আওয়াজ করল নবিতুন।

ইস্ যেন কিছুই জানিস না তুই ! কত আর ছিনালিপনা করবি ? বলে পকেট থেকে মুঠোখানিক টাকার নোট বের করে আনল কদম। টাকাগুলো ছুঁড়ে দিল নবিতুনের দিকে। নোটগুলো এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ল মাটিতে।

যেন চোখ কচলে বার বার দেখল নবিতুন। দেখল অনেক অনেক-গুলো নোটের ভেতর কতগুলো দুমড়ান প্যাঁচান। যে টাকা একদিন দলা পাকিয়ে লুন্দর শেখের মুখের উপর ছুড়ে মেরেছিল নবিতুন, একি সেই টাকা ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হঠাৎ নবিতুনের মনে হল সমস্ত ঘরটাই ঘুরছে। ভীষণভাবে ঘুরছে, ঘরের বেড়া, ঘরের পালা, ঘরের চাল। আর কাঁপছে পায়ের তলার ভিটাটি। ঘুরতে ঘুরতে গোটা ঘরটাই যেন ভেংগে পড়ল নবিতুনের মাথার ওপর। নবিতুন পড়ে গেল। পড়ে গেল কদমের ওজুর পানি ভরা বদনা আর খড়ম জোড়ার উপর। বদনার নলটা বুঝি গেঁথে গেল নবিতুনের পাঁজরে। কঁকিয়ে আর্তনাদ তুলে উঠোনে গড়িয়ে পড়ল নবিতুন। আক্কি বুঝি দৌড়ে গিয়ে তুলতে গেল মাকে। কদম ঠাস করে চড় বসিয়ে দিল ওর গালে। যেমন খানকি মা, তেমন মেয়ে। আমার মুখে চুনকালি দিয়ে মায়ে-ঝিয়ে বজ্জাতি করেছিস চৌধুরীবাড়ী ?

আচানক চড় খেয়ে স্তব্ধ হয়ে যায় আক্কি। তারপর ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। বাইরে নবিতুন আর কুঁকাচ্ছে না। চিত হয়ে পড়ে রয়েছে মাটির ওপর। যা ছোট চৌধুরীর ঘরে যা। খানকি 'মায়া মানুষ' নিয়ে ঘর করি না আমি। দরজাটা বন্ধ করে শুয়ে পড়ে কদম।

ভোরে ঘুম ভেঙ্গে সারেংবাড়ীর মেয়ে মুরদ সবাই দেখল, একটি মরা ছেলেকে পায়ের কাছে নিয়ে ঘুমিয়ে আছে নবিতুন।

বুঝি গলার আওয়াজ পেয়ে ঘুমটা ভেঙ্গে যায় নবিতুনের। ঘুম ভেঙ্গে গায়ের উপর শাড়ীটা ঠিক করে নেয় ও। তারপর মরা ছেলেটাকে কোলে নিয়ে ধীর পায়ে চলে আসে ঘরে।

কোরবান এসে বলে, চল কবর দিয়ে আসি।

খানকির পোলার আবার কবর কি ? যা গাঙ্গে ফেলে দিয়ে আয়। চিল্লিয়ে চিল্লিয়ে বলে কদম আর সুটকেস গোছায়। আজই চলে যাবে ও। মরা ছেলেটাকে শক্ত হাতে আঁকরে ধরে শুয়ে আছে নবিতুন। শরবতি এসে অনেক কষ্টে মৃতদেহটা আলগা করে তুলে দিল কোরবানের হাতে। মায়ের মেয়ে আক্কি। ভাত ফোটালো বাবার জন্য। বেপারী বাড়ী ছুটে বাকিতে কিনে আনল এক ছটাক সাবুদানা। লবণ দিয়ে রান্না করে তুলে ধরল মায়ের মুখে। অনেক দিনের উপবাসীর মতো দু'ঢোকেই সেটা খেয়ে নিল নবিতুন। একজোড়া লুঙ্গি, একখানি গামছা, দুটো জামা, একটা আয়না, একটা চিরণী—টিনের সুটকেসে জিনিসগুলো ভরে নিয়ে তৈরী হয়ে গেল কদম। নবিতুন শুয়ে শুয়ে দেখল। কিছুক্ষণ ফ্যাসফ্যাসিয়ে কাঁদল, হয়ত খোকার শোকে। এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল ও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুটকেসটি হাতে নিয়ে কদম যখন উঠানে নাবল আকাশে তখন মেঘ। বড় হিস্যা আর পুবের হিস্যায় গিয়ে সালাম বিদায়ের পর্বটা শেষ করল কদম। তারপর বিসমিল্লা বলে রওনা দিল।

শরবতি বলল, কদম ভাই, এ আপনার কেমন কান্ড। বুয়ার অসুখ আর আপনি চললেন ? দুটো দিন থেকে গেলে কি হয় ?

উত্তরে এমন করে তাকাল কদম, ডর খেয়ে যায় শরবতি।

গোটা সারেং বাড়ীটাই কদমের পিছে পিছে। বিদায় দিচ্ছে ওকে। ওদের মাঝে নেই শুধু নবিতুন।

কিন্তু ঘাট পর্যন্ত এসে ওরা আর এগোয় না। সেই যে মেঘ করেছিল সেই মেঘে চেয়ে গেছে আকাশ। পূর্ব দিকটা একেবারে কাঠকয়লার মতো কালো হয়ে গেছে। ওরা দাঁড়িয়ে পড়ল।

চোখ কুঁচকে দ্রুত ফেঁপে ওঠা মেঘগুলোকে দেখল শরবতির দাদু কামিজদ্দি বুড়ো। দেখল ওদের গায়ের রং, ওদের চেহারা আর স্বভাব। দেখে নিয়ে বলল—না। মেঘের নমুনা বড় ভাল দেখাচ্ছে না। বৃষ্টি হবে। বৃষ্টির সাথে ঝড়ও আসবে।

সত্যি, মেঘের নমুনাটা বড় ভাল নয়। সবাই আকাশের দিকে দেখল এবং সায় দিল কামিজ বুড়োর কথায়।

এমন সময় হাওয়া এলো। গরম হাওয়া। সে কী গরম, যেন ঝলসে দিয়ে গেল ওদের। প্রথম আঁচে ঝলসে গিয়ে ওরা যেন হকচকিয়ে বেবুঝ হয়ে রইল। তারপর মনে হল ওদের, কী এক আগুন হাওয়া হয়ে দক্ষিণ থেকে ছুটে যাচ্ছে উত্তরের দিকে।

শরবতির বাপ কামিজ বুড়ো হাতখানা বাড়িয়ে বাতাসের গায়ে ধরে রাখল কিছুক্ষণ। বাতাসটা কেমন গরম শুকনো গরম কি ভিজা গরম, তা যেন বুঝতে চেষ্টা করছে ও। তারপর আকাশটাকে আর একবার জরীপ করে বলল কামিজ বুড়ো—নারে, আজ যাসনারে কদম। আলামত বড় ভাল ঠেকছে না। কামিজ বুড়োর কথায় ঘার নেড়ে সায় দিল সবাই। ওদের নিজেদের অভিজ্ঞতা দিয়েই ওরা জানে গরম হাওয়া অলক্ষুণীর পূর্বলক্ষণ। গরম হাওয়া চড়ে ঝড় আসে, গরম হাওয়ায় বান ডাকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বান্দার জন্য খোদাতালার মেহেরবাণীর কি শেষ আছে? সব বিপদের আগেই মানুষকে সাবধান করে দেন তিনি। বলতে বলতে সেই পরম করুণাময়ের প্রতি কি এক কৃতজ্ঞতায় কোমল হয়ে আসে কামিজ বুড়োর বলিত মুখখানি।

বান আসবে এতে কোন সন্দেহ নাই। সাবধান থেকো তোমরা। রাতে কেউ ঘুমিয়ে পড়ো না যেন। বাড়ীর দিকে পা বাড়াল কামিজ বুড়ো। চলতে চলতে কদমের দিকে ফিরে বলল, আজ আর যাওয়া হয় না তোমার।

কামিজ বুড়ো বাড়ীর মুরুব্বী। তার কথা গওর করতে হয়। তার ওপর আকাশের অবস্থাটা সত্যি সুবিধের নয়। কদম ফিরে আসে। ফিরে এসে দেখে এখনো ঘুমোচ্ছে নবিতুন।

সারা বিকেল মেঘের ঘটায় আচ্ছন্ন হল আকাশ। গরম হাওয়া ঠান্ডা হল। সে হাওয়া বইল জোরে জোরে। হাওয়ার বাড়িতে গোত্তা খেয়ে ঘূর্ণী তুলে আকাশময় উন্মত্তের মতো ছুটে বেড়াল ঘনকৃষ্ণ মেঘ। হাওয়ার ধাক্কায় এক মেঘ সরে গেল তো হাজার মেঘ দৌড়ে এসে ঠাসাঠাসি জুড়ে বসল শূন্য জায়গায়। কদমের মনে হল, কোথাও বুঝি প্রলয় কান্ড ঘটে চলেছে। বড়টিনের ঘরে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি এল। কদমের ছনের ঘরে ঝমঝম বৃষ্টি নামল। বৃষ্টির শব্দেই ঘুম ভাঙল কদমের। ঘুম ভেংগে দেখল ওর বুকের উপর মাথা রেখে অঘোরে ঘুমোচ্ছে নবিতুন। পাটি-পাতা শাখার মতো চিকন কালো আর মসৃণ দুখানি বাহু নবিতুনের, সে বাহু দুখানি জড়িয়ে রয়েছে কদমের গলায়। নবিতুনের বাহু থেকে নিজেকে আলগা করতে গিয়ে আজ বড় দুঃখ হল কদমের। কেমন কষ্ট পেল কদম।

দিনভর বৃষ্টি চলল অবিরাম।

তারপর দিনও।

অঝোরে বৃষ্টি ঝরছে। ঘর ছেড়ে পা বারাবার উপায় নেই। বড় হিস্যার গোয়াল ঘরে হাম্বা হাম্বা চেঁচিয়ে চলেছে গরুগুলো। এই দুর্যোগে কে যাবে ওদের মুখে খের দিতে। চৌকিতে হাত পা ছেড়ে শুয়ে আছে কদম। চুলো ধরিয়েছে নবিতুন। রান্না চড়িয়েছে। ওকে দেখে বুঝবার উপায় নেই মাত্র তিন দিন আগে ছেলে হয়েছে ওর, তিন দিন আগে ওর সুমুখে ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছিল কদম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রান্না নাবিয়ে কদমকে খেতে ডাকে নবিতুন। নিঃশব্দে খেয়ে এসে চৌকিটার ওপর আবার হাত পা ছেড়ে দেয় কদম।

আক্‌কি, দরজাটা ভেজিয়ে দে। 'জোংরা' টা মাথায় দিয়ে বেরিয়ে পড়ল নবিতুন।

চোখ পড়ল কদমের। তড়াক করে চৌকি ছেড়ে দরজার দিকে লাফিয়ে পড়ল কদম। শুধাল, যাস কই ! কিন্তু ততক্ষণে বৃষ্টি ধারার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেছে নবিতুন।

দাওয়ায় এসে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ডাকল কদম, নবিতুন, ও নবিতুন। এই তুফানি বৃষ্টিতে যাস কই। শুনে যা। বৃথাই চেঁচান। কেননা কদম নিজেই বুঝছে তুফানি বৃষ্টির শব্দ ভেদ করে গলার আওয়াজটা হাত তিনেকের বেশী এগোচ্ছে না। কোথায় গেল রে। আক্‌কিকেই শুধায় কদম।

জানি না। সংক্ষেপে বলে আপন কাজে মন দিল আক্‌কি। বাপের ওপর একটুও সন্তুষ্ট নয় আক্‌কি। আর সেই অসন্তুষ্টিটা গোপন করবার কোন ইচ্ছে নেই ওর।

আক্‌কি মা, এদিকে আয়। ডাকল কদম। বৃষ্টির শব্দে ডাকটা বোধহয় কানে গেল না আক্‌কির। অথবা মায়ের মতোই কোন নীরবতার অস্ত্র ধারণ করেছে আক্‌কি। এক মনে পাটিপাতা বেত চিড়ে চলেছে ও। পাটি পাতাগুলো শুকিয়ে যাচ্ছে। তাই সকাল থেকেই আক্‌কিকে এ কামে লাগিয়ে দিয়েছে নবিতুন।

নাঃ, মেয়েটাকে সেদিন অমন করে চড় মারাটা সত্যি অন্যায় হয়েছে কদমের। কদম উঠে আসে। আক্‌কির মাথায় হাত রেখে বলে, বাপ একটি চড় মেরেছে আর অমনি মেয়ের গোসা।

তা কেন হবে ? শুধু চড় কেন। সেদিন থেকে বাপের কোন কাজটাই ভাল লাগছে না আক্‌কির। নীরবে চোখ তুলে সে কথাটাই যেন জানিয়ে দিল আক্‌কি।

দে, ছেনিটা দে। আক্‌কিকে সরিয়ে নিজেই বেত চিড়তে বসল কদম। ভিজে সপসপে গা ফিরে এল নবিতুন। কাপড় বদলিয়ে চুলের পানি ঝাড়ল। আধবোনা চাটাইটা বিছিয়ে নিল চৌকির সুমুখে মাটির মেঝেতে। তারপর আক্‌কির হাত থেকে চেড়া বেতের গোছাগুলো নিয়ে বসে গেল চাটাই বুনতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চৌকিতে ফিরে এল কদম। শুয়ে পড়ল। বার কয় হাত পা ছুঁড়ল। উঠে বসল। চীৎকার করে শুধাল—কোথায় গেছিলি ?

মাতন নেই নবিতুনের। চেরা পাটিপাতা বেত একটার পর একটা বিছিয়ে চলেছে ও। সিদাসিদি। আড়াআড়ি। কোণাকোণি। আজ হাতে চুড়ি নেই নবিতুনের।

কথা বলে না কেন নবিতুন। ছটফট করে কদম।

খাট ছেড়ে নেমে আসে কদম। একগোছা বেত নিয়ে বসে পড়ে নবিতুনের পাশে। বিছিয়ে যায় পাটিপাতা বেত। আড়াআড়ি সিদাসিদি। কিন্তু ভাল লাগে না ওর। কেন চুপ নবিতুন ? উঠে এসে আবার শুয়ে পড়ে কদম।

ঝুম ঝুম ঝপঝপ বৃষ্টি পড়ছে। পড়ছে তো পড়ছেই। কোন লক্ষণ নেই থামার। গোটা দুনিয়াটাকেই যেন ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।

হাঁটুর উপর চিবুক রেখে এক মনে চাটাই বুনে চলেছে নবিতুন।

চৌকির ওপর ছটফট করে কদম। এই নিঃশব্দ নবিতুন আর ওই ঝুপঝুপ বৃষ্টি বুঝি পাগল করে দেবে কদমকে।

তুই কি বোবা হয়েছিস ? তোর কি মুখ নেই ? চেঁচিয়ে ওঠে কদম। নীরব নবিতুন। ক্ষণিক দৃষ্টিতে কদমকে একটিবার দেখেই আবার কাজে মন দেয় ও।

নবিতুনের ক্ষণদৃষ্টির তীক্ষ্ণতায় কি যেন দেখল কদম। এক লাফে নেমে এল চৌকি ছেড়ে। নবিতুনের হাত থেকে কেড়ে নিল বেতের গোছাগুলো, ছুঁড়ে দিল দূরে। চিল্লিয়ে উঠল, লুন্দরমামু, পোস্টমাস্টার —ওরা কি মিথ্যা বলেছে ? চুপ কেন তুই ? তুই কিছু বলিস না কেন ? বল বল এ সব মিথ্যা ? কি যেন বলল নবিতুন। কিন্তু শোনা গেল না ওর কণ্ঠ। পৃথিবীর সমস্ত কণ্ঠকে ডুবিয়ে আকাশের বজ্র তখন কি এক ভীষণতায় ফেটে পড়েছে মাটির জগতে। মনে হল দুনিয়াটাকে যেন এ ফোঁড় ও ফোঁড় করে গেল। মুহূর্তের জন্য ওরা বধির হল। কন্ঠ ওদের স্তব্ধ হল। ধাক্কাটা সামলে নিয়ে দরজা খুলল কদম। দেখল বজ্রের সাথে সাথে বৃষ্টির তোড়টাও যেন কমে এল।

সত্যি কমে এল।

সত্যি কমে এল বৃষ্টিটা।

অল্পক্ষণের মধ্যেই থেমে গেল বৃষ্টিটা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উঠোনের জমা পানি গল গল করে নেবে যাচ্ছে ক্ষেতের দিকে।

বেরিয়ে এল কদম। পুবের হিস্যা আর বড় হিস্যার ছেলে-বুড়োরাও বেরিয়ে এল। উঠোনে এসে হাত পা ছুঁড়ে একটু শান্তি পেল ওরা। দুদিন দু রাত্রির অবিরাম বর্ষণে ঘরে বসে বসে হাত পা যেন জমে গেছে সবার। শরবতির বাপ আর কামিজ বুড়ো গেল গোয়াল ঘরে। কোরবান গেল ঘাটার দিকে ধানের শীষ ডুবে গেছে না জেগে আছে, তাই দেখতে। কদম ভাবছে, রাস্তা ঘাট কি ডুবে গেল? রাস্তা-ঘাট ডুবে গেলে আরো দেরী হয়ে যাবে ওর রওনা দিতে! অবস্থাটা দেখার জন্য ঘাটার দিকেই পা বাড়াল কদম।

কিন্তু ওর পাটা ওঠবার আগেই গোটা আকাশটা যেন খান খান হয়ে ভেংগে পড়ল, গোটা দুনিয়াটা থর থর কেঁপে উঠল। কদমের মনে হল পায়ের তলার মাটিটা কোথায় যেন সরে গেছে, শূন্যে দাঁড়িয়ে আছে ও। ভীতা আক্কি ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল বাপজানকে।

পর পর তিনবার বাজ পড়ল। তিনবার আকাশ ফাটল। তিনবার দুনিয়াটা ঝাঁকুনি খেল।

আলামত বড় খারাপ। আলামত বড় খারাপ। যে যার ঘরে যাও। যে যার ঘরে যাও। দোয়া পড়। গোয়াল ঘর থেকে চেঁচাতে চেঁচাতে আসছে শরবতির দাদু কামিজ বুড়ো।

কামিজ বুড়ো উঠোন তক পেঁছিতে না পেঁছিতেই আবার বাজ পড়ল।

লাহাওলা লাকুয়াতা ইল্লাবিল্লাহ.....জোরে জোরে শয়তান বিতাড়নের অব্যর্থ দোয়াটা পাঠ করল কামিজ বুড়ো। আবারও চিল্লিয়ে বলল সবাইকে, যে যার ঘরে যাও গো। আল্লার নাম ডাক। আলামত বড় ভাল নয়। মুহুর্মুহু বজ্রের হুংকারে কোরবানও ভয় পেয়েছে। এক দৌড়ে ঘাটা থেকে এসে পড়েছে ও। কোরবান বাবা, জোরে জোরে একবার আজান দে তো বাবা। ওকে দেখে বলল কামিজ বুড়ো।

তাড়াতাড়ি ঘড়ার পানিতে ওজু করে এল কোরবান। উঠোনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কিবলামুখি হল। কানে আঙ্গুল দিল। তারপর গলা ছেড়ে আজান দিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এতক্ষণ বাজ পড়ছিল, কিন্তু বাতাস ছিল নিথর। এবার বাতাস ছাড়ল। ঠাণ্ডা বাতাস। প্রথমে দুটো একটা মৃদু ঝাপটা। তারপর অকস্মাৎ তীব্র বেগে ছুটে এল, ঝাপটার পর ঝাপটায় ঘরদোর গাছ-গাছালির উপর আছড়ে পড়ল বাতাস। মট মট করে উঠল কদমের ঘরের নতুন তোলা চালটা। আক্কি তাড়াতাড়ি একটা পিড়ি ছুঁড়ে দিল উঠোনে। ছড়া বললঃ

আইঠ্যা কলার ছাউনি
ভেরনের খাম,
পবন ঠাকুর বইসো বইসো।

কিন্তু সে আবেদনে পবনের করুণা হল না। হাওয়ার বেগ কমল না। হিস হিস শাঁই শাঁই গাঁই গাঁই বিচিত্র ভয়-জাগানো শব্দ তুলে হাওয়ার পর হাওয়া ছুটে আসছে। ঘরবাড়ী জঙ্গল সবই যেন উপড়ে নিয়ে যাবে এই ক্রুদ্ধ বাতাস।

এই তোরা সব চলে আয়। বড় ঘরে চলে আয়। শীগগীর চলে আয়। বাতাসের তোড় দেখে বড় হিস্যা থেকে ডেকে উঠল কামিজ বুড়ো।

বড় হিস্যার বড়ঘর যেমন উঁচু তেমনি মজবুত। তাই যে যার ঘর বন্ধ করে বড়ঘরে এসেই উঠল।

আজান দে আজান দে বাবা। তাড়া দিল কামিজ বুড়ো।

আবারও আজান দিল কোরবান।

কি যে তুই আজান দিলি, এই পাঁচ হাত দূরে বসেও ভাল করে কানে এল না আমার। গলায় জোর নেই নাকি? খিঁচিয়ে উঠল কামিজ বুড়ো। কোরবান বলল, আমার কি দোষ? বাতাসের তোড়, তাতে গলা ফাটিয়ে মরলেও কয় হাত আর পেঁছবে গলাটা।

এই কৈফিয়তে আদৌ সন্তুষ্ট নয় কামিজ বুড়ো। বলল, আসলে তোরা জানিস না বুঝিস না কিছুই। আজান হল শয়তানের যম। আজানের এক একটি শব্দ যতদূরে পেঁছবে তার ত্রিসীমানায়ও ঘেঁসতে পারবে না শয়তান। বলে নিজেই গলা ফাটিয়ে আজান দিল কামিজ বুড়ো। কিন্তু সে আজান কামিজ বুড়ো ছাড়া আর কেউ শুনল না।

কমে এল বাতাসের বেগ? আকাশটাও একটু ফর্সা হয়ে এল। হাসল কামিজ বুড়ো। বলল, দেখলি তো? কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই কানটা খাড়া করল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কানটা খাড়া করে কি যেন শুনতে চাইলো স্পষ্ট করে। তারপর চিন্তিত মুখে তাকাল কদমের দিকে। বলল—শুনছিস কদম ?

হ্যাঁ। কদমও শুনছে। বহুদূর থেকে ভেসে আসছে শোঁ শোঁ এক আওয়াজ। ক্ষীণ আওয়াজ। কিন্তু কান পাতলেই শোনা যায়।

প্রথমে মনে হয়েছিল অনেক, অনেক দূরে বহু মেঘ একসাথে ডেকে উঠেছে, এ বুঝি তারই আওয়াজ। কিন্তু না এ মেঘের ডাক নয়। অন্য কিছু।

বিদ্যুৎ চমকে যায় ঘন ঘন। মনে হয় কোন্ হিংস্র জল্লাদ আকাশময় বিজলীর চাবুক ঘুরিয়ে চলেছে। ওদের চোখ ঝলসে যায়। কিছুক্ষণের জন্য অন্ধ হয়ে যায় ওরা।

লা হাওলা পড় মিঞারা, লা হাওলা পড়। সবাইকে তাম্বি দিল কামিজ বুড়ো। নিজেও দম বন্ধ করে লা হাওলা পড়ে চলল।

আক্কি অবাক হয়ে দেখছে, এতগুলো বিজলীর তীর চিড়ে চিড়ে গেল আকাশের বুকটা অথচ আকাশ যেই কে সেই। যেন কিচ্ছু হয়নি তার। তাকাস না তাকাস না আসমানের দিকে। এ হল শয়তানের তীর। শয়তানের তীর আগুনের তীর। ওদিকে তাকাতে নেই। বলতে আক্কির চুলের মুঠিটা ধরে ওকে ঘরের দিকে ঠেলে দিল কামিজ বুড়ো।

সহসা পূর্ব দক্ষিণ কোণ থেকে ছুটে এল কতগুলো মেঘ। কালো কালো বিরাটকায় দৈত্যের মতো মেঘ! মেঘগুলো গ্রাস করে নিল আকাশটাকে। অন্ধকারে ছেয়ে গেল দুনিয়াটা।

দিনের বেলায় এমন ঘুর ঘুটি 'অন্ধকার' ? কেউ কখনো শুনেছে, না দেখেছে। আর কী চেহারা আকাশটার!

আঁধার আঁধার, চারিদিকেই আঁধার। ওরা যেন কিছুই দেখছে না চোখে। এই শরবতি, এই কোরবানের বৌ, যা যা ঘরে যা তোরা। দোয়া পড়, আল্লাকে ডাক। মেয়েদের দিকে তাকিয়ে বলে কামিজ বুড়ো আর বিড় বিড় দোয়া পড়ে চলে।

পশ্চিমমুখী হয়ে ফের আজান দিল কোরবার।

ও চাচা, এতো বানের ডাক। পানির গর্জন। শুনছ না ? সহসা চেঁচিয়ে ওঠে কদম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কানটাকে বুঝি একটু সজাগ করল শরবতির দাদু। বলল, তাই তো তখন বলেছিলাম তোকে।

কামিজ বুড়োর দেখাদেখি সবাই কান খাড়া করল। এ ডাক বানের ডাক, এতে কোন সন্দেহ নেই কারো। সাগরটা এখান থেকে মাইল দুয়েক দূরে। গভীর রাতে কখনো ঘুম ভেঙ্গে ওরা শোনে সমুদ্রের চাপা গর্জন, এমনি শোঁ শোঁ আওয়াজ। সাগরটা যখন ক্ষেপে যায় তখনি এমন করে ডাকে।

এতক্ষণে আঁধারিটা যেন থিতিয়ে গেছে ওদের চোখে, ভাল করে চারিদিকে চেয়ে দেখল ওরা। পরস্পরের দিকে তাকাল। পরস্পরকে যেন অভয় দিল। মেয়েদের মুখে, ছেলেদের মুখে রা নেই। ঘরে বসে ভরসা পায় না। টিপ টিপ করে ওদের বুক। বজ্রের এমন হুংকার কখনো শোনেনি ওরা। এমন স্তব্ধ খাওয়া থমথমে আবহাওয়া, দিনের বেলায় এমন কুচকুচে আঁধার এমন ঘনকৃষ্ণ ভয়ঙকর আকাশ কখনো দেখেনি ওরা। ঘর ছেড়ে দাওয়ায় আসে ওরা। দাওয়ায় পুরুষগুলোর পাশে গুটিসুটি বসে পরে ওরা।

শোঁ শোঁ ও° ও°। আওয়াজটা নিকটতর হচ্ছে। আওয়াজটা বাড়ছে তার ভয়ে স্তব্ধ খেয়েছে বাতাস।

ধুক করে ওঠে কদমের বুকটা। সমুদ্রের মানুষ সে। সমুদ্রের এই হুংকার কোন প্রলয়ের পূর্বাভাস সে জানে। কামিজ বুড়ো আর কোরবান ওরাও জানে সহস্র ফণা মেলে সাগরটা যখন আসমান উঁচু হয়ে ধেয়ে আসে কেবলমাত্র তখনি এমনি শব্দ হয়, এমনি হিংস্র গর্জনে আকাশ বাতাস কেঁপে যায়। সেই গর্জন আর সাগরের সেই করাল মূর্তির সুমুখে অতি বড় দুঃসাহসী নাবিকেরও বুক কাঁপে।

ওরা বুঝি ভয় পেল। ভয়ে স্তব্ধ হয়ে রইল। আর ওদের রক্তহীন মুখের দিকে তাকিয়ে মেয়েরা বুঝি চোখ বুজল। শিশুরা আকড়ে ধরল মায়ের গলা। দৈত্যের মতো কালো মেঘগুলো সরে গেল পশ্চিম দিকে। কিন্তু ফর্সা হল না আকাশ। শুধু আঁধারি ঘোরটা সামান্য কমে একটু সাফ হল আবহাওয়াটা।

শোঁ ও° ও° শোঁ ও° ও°। এবার আওয়াজ নয়। লক্ষ দৈত্য-দানব যেন ক্রুদ্ধ গর্জনে হুংকার ছেড়ে ছুটে আসছে।

কিসের এই গর্জন!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বামনছাড়ি পিয়লগাছা আর মাদার টেকের মত অসংখ্য না-দ্বীপ না গ্রামকে ঘিরে যে কয়াল নদী, তার ? নাকি দূর সাগরের ? না, কয়ালে এত পানি নেই। কয়ালের অমন শক্তিও নেই। যে সাগরের শব্দ শুনে ওদের অনেক মাঝ রাতের ঘুম গেছে ভেংগে। আজকের এই গর্জনের সাথে তার তুলনা চলে না। এ যেন অজস্র সাগরের উন্মত্ত হুংকার। বুঝি সমুদ্রটা কখন এত কাছে এসে পড়ল। বুঝেও যেন সন্দেহ থেকে যায় কোরবানের। ও জিজ্ঞেস করে, কিসের ডাক ? বানের ডাক। সর্বনাশের ডাক। বলল শরবতির দাদু কামিজ বুড়ো। এমন ডাক তো কখনো শোনা যায়নি। বলল কোরবান।

শোনা গেছিল সেই তিরাশি সনে যখন গরকী এসেছিল। বলল কামিজ বুড়ো।

ভয়টা যেন দ্বিগুণ ভারি হয়ে যেতে বসল ওদের উপর। মেয়ে আর মরদ। কি এক মংগল, কি এক ভয়ংকর দুর্যোগ আশংকায় কাঁপছে ওদের বুক। ঝড়-তুফান, বৃষ্টি-বাদলার সাথে ওদের আজন্ম পরিচয়। বান আসে, বানের পানি ভাসিয়ে নিয়ে যায় কয়ালের দু'পার। এত শিশুকাল থেকেই দেখে আসছে ওরা। বানের পানিতে ডুবে যায় উঠোন, ঘরের ভিটি। তখন ঘরের ভেতরই মাচাং বানিয়ে থাকে ওরা। দুদিন চারদিন। তারপর নেবে যায় পানি। তাই ঝড় তুফান বৃষ্টি বন্যাকে ভয় করে না ওরা।

কিন্তু আজকের দুর্যোগ যেন কোন প্রলয়ের ঘোষণা। যেন কোন নিষ্ঠুর অপদেবতার অভিশাপ হয়ে আকাশ ভেঙ্গে পাতাল ফুঁড়ে সারা জাহান তোলপাড় করে নেবে আসছে মহাপ্রলয়। যা পৃথিবীর মানুষ দেখেনি কখনো। দয়াহীন মায়াহীন ক্ষমাহীন নিষ্ঠুর এক অজানা, তারই সুমুখে বাধ্য পশুর মতো দুরু দুরু ওরা। ওরা অসহায়।

কামিজ বুড়ো তখন বলতে শুরু করেছে, আজকের গর্জনের সাথে সেই গরকীর ডাকের তুলনা হয় কখনো ? সে কী গর্জন। সে কী হুংকার। মনে হয়েছিল হাজার ইস্রাফিল হাজার শিংগায় ফুঁ দিয়েছিল। সেই ডাকে কেঁপেছিল আসমান-জমিন, সারা জাহান। গরকীর পানিতে ভেসে গেছিল মানুষ গরু পশু পক্ষী। একাকার হয়েছিল আসমান-জমিন ঘরবাড়ী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কামিজ বুড়ো এমন করে বলে যেন তারই জীবনের প্রত্যক্ষ ঘটনা।

সারেং বাড়ীর ছেলে বুড়ো সবাই জানে এই তিরাশি সনের গর্‌কীর কথা।

কামিজ বুড়োর মুখেই শুনেছে ওরা। কামিজ বুড়ো শুনেছে তার বাবা গয়েসুদ্দির কাছে, গর্‌কীর বছর গয়েসুদ্দি মোটে দশ বছরের নাবালক। গয়েসুদ্দির বাপ আজবুদ্দি ছেলেকে গামছা দিয়ে বুকের সাথে বেঁধে তিন দিন তিন রাত্রি ভেসে ছিল সেই মহাপ্লাবনের পানিতে। ওরা বাপবেটা ছাড়া সারেং বাড়ীর পাঁচ হিস্যার পঁয়ত্রিশজন বাসিন্দার ভেতর আর কেউ বাঁচতে পারেনি সেবার।

সেই গর্‌কীর কাহিনী বহুবার শুনেছে ওরা। শুনে শুনে কঠিন সেই দুর্যোগটা ওদেরই জীবনের কোন অতীত অভিজ্ঞতার মতো গেঁথে রয়েছে ওদের মনের পটে। আজকের আসন্ন দুর্যোগ কি তার চেয়েও ভয়ংকর? ওরা যেন শিউরে ওঠে।

কামিজ বুড়ো এখনো বলে চলেছে, 'আবশ্যক' তিরাশি সনের গর্‌কীর আগেও বহুবার বানের পানি ভাসিয়ে নিয়ে গেছে আমাদের এই বদনসিব বদকিসমত দেশটাকে। 'ছিত্তেছান' হয়েছিল ঘরদোর, হাট বাজার। লাখে লাখ মানুষ, বোঝি মাবোন বেটাবেটি আর ওদের যত গরুছাগল মোষ, স-ব মরে সাফ হয়েছিল। বিরানা হয়েছিল এই মুলুকটা। সে কি আজকের কথা? আর সে একবার দুবার নয়, বহুবার। মুরুব্বীদের কাছে শোনা। তবে, মুরুব্বীরাই বলে গেছেন, তিরাশি সনের গর্‌কীর কাছে ওসব কিছুই না। আল্লার গজব।

আজও তেমনি আল্লার গদব নেবে আসছে? আল্লা কি এতই নির্দয়? ভয়ে আতংকে রুদ্ধশ্বাস ওরা। রুদ্ধশ্বাস ওরা চেয়ে থাকে কামিজ বুড়োর মুখের দিকে। এই প্রশ্নটার কি জবাব দিতে পারে না কামিজ বুড়া?

খোদার লানত যখন পড়ে তখন এমনি করেই পড়ে। দুনিয়াদারির পায়বন্দী এই আদনা মানুষ তাকে কেমন করে ঠেকাবে? বুঝি ওদের অনুচ্চারিত প্রশ্নের জবাবেই বলে চলে কামিজ বুড়ো। ভীত আতংকিত মেয়েরা চোখ বড় বড় করে শুনে যায় ওর কথা।

হযরত নুহের কথা বলেছি না তোদের? সেই নু-সাল্লামের জামানায় পাপে ভরে গেল দুনিয়া। গোনাহ্‌ গোমরাহ হাজারো পাপে ভরে আছে মানুষের মন। মানুষ ভুলে গেছে খোদাওয়ানতার কথা, নেক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাজ, নেক চিন্তা, সব। নূহ-সাল্লাম ওদের ডেকে বললেন, হে মানুষ। তোমরা নেকির পথে ফিরে আস, পাপের রাস্তা ছেড়ে নেক কথা নেক চিন্তার পথে আস। আমি বলছি, খোদাওয়ানতালা সহ্য করবেন না এত পাপ। আসমান থেকে পানি ঢেলে তামাম দুনিয়া বিয়ে দেবেন তিনি। সব পাপ, সব গোনাহগার বান্দা ভেসে যাবে। তোমরা সাবধান হও...

নূহ-সাল্লামের কথা শুনে মানুষ হাসল। ঠাট্টা করল। তবু আল্লার পয়গম্বর নূহ-সাল্লাম সাবধান করে ওদের। ওরা শুধু ঠাট্টা করে।

দিন যায়। মাস যায়। হুঁশিয়ার করে চলেন ওদের। ওরা হেসে উড়িয়ে দেয় তাঁর কথা।

শেষে এল সেইদিন, সেই গজবের দিন। আকাশ ফেটে পানি পড়তে লাগল। মাটি ফুঁড়ে পানি উঠতে লাগল। নূহ-সাল্লাম বানিয়ে রেখেছিলেন মস্তবড় এক জাহাজ। নিজের পরিবার আর নেকবক্তদের নিয়ে তিনি গিয়ে উঠলেন এই জাহাজে। মানুষদের ডেকে বললেন তিনি, এখনো সময় আছে, উঠে এস জাহাজে। ওরা ঠাট্টা করে বলল, তুমি থাক তোমার জাহাজে। পানির তোড়ে কতক্ষণ টিকবে ওই জাহাজ! আমরা চললাম পাহাড়ে। বানের পানি তো আর পাহাড়কে ছাপিয়ে যেতে পারবে না। এদিকে পানি উঠছে তো উঠছেই, তার আর ক্ষান্তি নেই। জন্তু জানোয়ার পশুপক্ষী দুনিয়ার যত প্রাণী রয়েছে সবই একজোড়া একজোড়া করে আপন জাহাজে তুলে নিলেন নূহ-সাল্লাম। পানির উপরে ভেসে ভেসে চলল তাঁর জাহাজ।

ওদিকে সেই পাপী আর মূর্খের দল। পাহাড়ে উঠেও ওরা রক্ষা পেল না। দেখতে দেখতে ডুবে গেল তামাম দুনিয়া। সেই পাহাড়ও। উঠতে উঠতে পানি আসমান ছুঁল। পাপ আর পাপী সবাই ডুবে মরল। বাঁচল শুধু নূহ-সাল্লাম আর তাঁর জাহাজের নেকবক্ত ছোট্ট দলটি। সেই এক গরুকী হয়েছিল বটে।

এই কিসসাও নতুন নয়। সারেং বাড়ীর ছেলেমেয়ে, এই বামনছাড়ি, কদুরখিল, মাদারটেকের ছেলেমেয়েরা ভূমিষ্ঠ হয়েই শুনে আসছে এ কাহিনী।

আহা চাচা, লম্বা কিস্সা তোমার থামাও না। চেঁচিয়ে উঠল কদম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেমন অকস্মাৎ কোন এক অজানা ত্রাসে স্তব্ধ হয়ে থমকে ছিল বাতাস তেমনি অকস্মাৎই শুরু হল তার দাপাদাপি, তুফানি তাণ্ডব।

কি এক উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে পড়েছে কদম।

ওর কাঁধগুলো আর বাহুজোড়া ফুলে উঠেছে। লুংগিটাকে খাটো করে কোমরের সাথে শক্ত করে গিট বেঁধেছে ও। মেয়েদের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো ও, এই মেয়েরা! ভয়ে ঘুপছি মেরে বসে থাকলে বাঁচবি তোরা? দেখছিস না দুনিয়ার আলামত? শক্ত করে গিঁট দিয়ে শাড়ী বাঁধ কোমরে। খবরদার, উল্টোমুখি সাঁতার কাটবি না। হাত পা ছুঁড়বি না। পানির সাথে লড়তে যাবি না। শুধু ভেসে থাকবি। মুখটাকে ভাসিয়ে রাখবি পানির ওপর। সবাই তো সাঁতার জানিস—কদমের কথাটা পুরোপুরি শেষ হল না। বাতাসের ঘূর্ণি এসে উড়িয়ে নিয়ে গেল সুন্দরী কাঠের পালা। গাছের আগাগুলো বেঁকে এসে মাটি ছুঁল। এ কী ক্ষেপা বাতাস। ঝাপ্টার পর ঝাপ্টা আসছে। আসছেই। গাছ উপড়ে। ঘর ভেঙ্গে। আকাশ পাতাল মাথায় করে।

নবিতুন দেখল ওর বরই গাছটা বাতাসের হ্যাঁচকা টানে পুবের হিস্যার উঠোনে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল।

সহসা ওদের মাথার উপর কামিজ বুড়োর ঘরের দুখানি টিন লাফিয়ে উঠে ঝাঁ করে উড়ে চলে গেল আকাশের শূন্যে।

ভয়ে চোখ বুজল মেয়েরা। চোখ বুজে চীৎকার করে উঠল। চীৎকার করে আক্কি। কামিজ বুড়োর টিন উড়িয়ে নিয়ে বুঝি বা একটু ধিমিয়ে এল বাতাসের রোষ।

চারিদিকে কান্নার রোল পড়েছে। বেরিয়ে এসেছে পাল বাড়ী, ভুঁইঞা বাড়ীর মেয়েমরদ। ওরা ছুটছে আর চেঁচিয়ে চলেছে, বান এল গো বান এল, গরকী এল।

পানি উঠেছে। পানি উঠছে। আর রক্ষা নেই। সহসা কি এক অসহায়ের মতো বলে উঠল কোরবানের বৌ।

এক ঝটকায় নবিতুনকে কাছে টেনে নিল কদম। আক্কি আর নবিতুন দু'জনকে দু'বাহুতে বেঁধে লাফিয়ে পড়ল উঠোনে। উঠোন থেকে চিল্লিয়ে চিল্লিয়ে ডাকল ওদের, এই কোরবান। বুদ্ধিসুদ্ধি খোয়ালি নাকি? শীগগীর ওদের নিয়ে বেরিয়ে আয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শরবতির বাপ আর কোরবান বাচ্চাদের হাত ধরে টানতে টানতে বেড়িয়ে এল। মেয়েদের ডাকল, আয়। সবাই যাচ্ছে শেখ বাড়ী। দৌড়ে দৌড়ে, সবাই শেখ বাড়ীর দালানে গিয়ে ওঠে।

ওরা সবাই ছুটল শেখ বাড়ীর দিকে।

কামিজ বুড়োর কী হয়েছে কে জানে। হয়ত ক্ষিপ্র প্রকৃতি আজ ওকেও ক্ষেপিয়ে দিয়েছে। যেন কেউ ওকে নিয়ে যাবে তাই বারান্দার পালাটাকে দু'হাতে আঁকড়ে রয়েছে ও আর চিল্লিয়ে চলেছে, কী হবে দৌড়ে! কোথায় পালাব। পাপ। পাপ। পাপে ভরে গেছে দেশ। এত পাপ সইবে কেন আল্লা ?

হঠাৎ শরবতির কোলে ছেলেটার দিকে চোখ পড়ল কামিজ বুড়োর। এক লাফে নেমে এল শরবতির কাছে ছেলেটাকে তুলে নিল বুকে। আর এক হাতে শরবতিকে ধরে ছুট দিল শেখ বাড়ীর দিকে।

অনেক দূর থেকে কে যেন চীৎকার করে বলে চলেছে। গর্‌কী এল গো। গর্‌কী এল। ধেয়ে আসছে বানের পানি।

পাল বাড়ীর কয়েকটা মেয়ে পিছিয়ে পড়েছে। শেখ বাড়ীর দিক থেকে কোন এক নারীকণ্ঠ ডাকছে ওদের, আয়। জলদি আয়। আকাশ পাতাল চুরমার করে আসছে বানের জল।

বুঝি এসে গেল বানের পানি।

সেই সাথে বৃষ্টি।

সেই সাথে হাওয়ার তোড়।

কোন কথা, কোন কণ্ঠ আর শোনা যায় না। সমস্ত শব্দ লয় পেয়েছে সেই একটি মাত্র ভয়ংকর শব্দ গর্জনে—শোঁ ও° গোঁ ও° ও° গোঁ ও° শোঁ শোঁ ও° ও°। বুঝি বেজে উঠেছে ইস্রাফিলের শিংগা, বেজে উঠেছে রুদ্র দেবতার প্রলয় বিষাণ। আকাশ ভেঙ্গে পড়েছে পৃথিবীর বুকে। খান খান চুর চুর হয়ে মাটির পৃথিবীটা ছিটকে পড়ছে, লীন হতে চলেছে কোন শূন্যলোকে। বুঝি মহাসৃষ্টির ধ্বংস আজ।

কে যেন হুড়মুড় খেয়ে পড়ল কদমের গায়ে।

কদম চিনল না। বৃষ্টিতে চুপছে গেছে ওর চোখ।

কিন্তু পড়ে পড়েও উঠে দাঁড়াল লোকটি—ইয়া আল্লাহ্‌ এ কী গজব, এ কী কেয়ামত নাজেল করলে তুমি !

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টলতে টলতেই চিল্লিয়ে চলেছে লোকটি।

কেয়ামত। কেয়ামত এসে গেলরে। আজ আসমান-জমিন দুনিয়া-জাহান মিসমার হবে, একাকার হবে। দেখছিস না পাপ, কত পাপ ঢুকেছে আমাদের মাঝে। পাপের মুল্লুক যে আজ ছারখার হবে।

কোন সুদূর থেকে ভেসে আসা ক্ষীণ এক অভিসম্পাদের মতো কথাগুলো শুনল কদম। তারপর ও যেন দেখল প্রচণ্ড বাতাসে উড়িয়ে নেয়া পাতার মতো ঘূর্ণি খেতে খেতে অদৃশ্য হয়ে গেল কামিজ বুড়ো। কামিজ বুড়োর বুকের কাছে তখনো আগলে ধরা শরবতির বাচ্চা ছেলেটি।

কদমের কানের সাথে মুখ লাগিয়ে শুধাল নবিতুন, কই যাও ?

কেন, লুন্দর মামুর দোমালা দালানে ? সেখানেই তো যাচ্ছে সবাই। বলল কদম।

কখনো না। মরে গেলেও না। বলে সামনের করই গাছটা আঁকড়ে ধরল নবিতুন। এক পা দু পা করে চড়ে গেল গাছে। মার পিছু পিছু আক্কিও।

এ কী করছিস নবিতুন ? গাছের ওপর কতক্ষণ, কদ্দিন থাকবি ? এ গাছ স্রোত এসে উপরে ফেলবে, নেবে আয় নেবে আয়। নেবে আয় নবিতুন। মরিয়া হয়ে গলা ফাটিয়ে চেঁচায় কদম।

গাছের ওপর থেকে নবিতুন চেঁচিয়ে চলেছে ওর সমস্ত শক্তি দিয়ে। কিন্তু প্রলয়ের হুংকার গর্জনে তলিয়ে যাচ্ছে ওর গলা। কিছুই কানে আসছে না কদমের। শুধু দেখল বার বার দক্ষিণ দিকে আঙুল আর হাত নেড়ে কি যেন দেখাচ্ছে নবিতুন। মুখ ঘুরিয়ে দক্ষিণ দিকটা দেখে নিল কদম। দেখে নিয়ে এক মুহূর্ত বিলম্ব করল না। তর তর করে উঠে এল গাছের আগায়।

দক্ষিণ থেকে আসছে পানির পাহাড়। আসমান জমিন তোলপাড় করে আসছে বিরাট ঢেউ।

কোন সমুদ্র অদেখা কদমের। কিন্তু সমুদ্রে অত বড় ঢেউ কখনো দেখেনি কদম। কোথায় আকাশ কোথায় মাটি। আকাশ আর মাটি ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল ভয়ংকর পানির প্রাচীর। সে প্রাচীর ধেয়ে আসছে ওদের দিকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আক্‌কি মা, শক্ত করে জড়িয়ে থাক গাছটাকে, বলল কদম। আর নিজের বাহুর বেষ্টনে করই গাছের কান্ডসহ কোমরটাকে জড়িয়ে রাখল কদম।

তারপর ওরা চোখ বুজল।

ঢেউটা ওদের পায়ের তলা দিয়ে চলে গেল।

ওদের পায়ের তলা দিয়ে চলে গেল, কিন্তু ডুবিয়ে গেল বামনছাড়ি গ্রামটা। ভাসিয়ে নিল ঘরবাড়ী। ভেসে গেল গরু ছাগল মোষ আর কিছু মানুষ। কদম নবিতুন, ওরা চোখ মেলে দেখল লুন্দর শেখের দোমালা দালান ছাড়া আর কোন ঘর অবশিষ্ট নেই বামনছাড়িতে।

ও কি চৌধুরী বাড়ীর দালানটা ? এই একটু আগেও আমরা দেখলাম যে ? উৎকণ্ঠা ঝরে নবিতুনের কণ্ঠে।

চৌধুরী বাড়ীর দালান পানির তলায়। সংক্ষেপে বলল কদম।

ভীষণ বেগে স্রোত যাচ্ছে। করই গাছটা সরু একটি কাঠির মতো থর থর কেঁপে চলেছে।

আহা ডুবে গেল চৌধুরী বাড়ীটা। ছোট বৌটা বড় ভাল, নেকদিল ছিল গো। আহা ছোট বৌটা কি ভেসে গেল ? নবিতুনের বড় দুঃখ হল ছোট বৌর জন্য।

ছোট বৌর শোকে গাছের উপর কাঁদতে বসলি নাকি তুই ? খিঁচিয়ে উঠল কদম।

না গো না। ছোট বৌর মতো মানুষ হয় না। ছোট বৌই তো আমাকে সব বলল।

বলল ? কী বলল ? এক চোখ পানির দিকে আর এক চোখ নবিতুনের দিকে রেখে শুধাল কদম।

বলল, কেমন করে ওই শুয়রের জাত লুন্দর আর ওই হারামির ব্যাটা 'পোস্টমাস্টার' সাজস করে আটকে রেখেছিল তোমার সব চিঠি। আমার চিঠিগুলোও যেতে দেয়নি। আর বলল, কার কার হাত দিয়ে তোমার টাকা আসত লুন্দরের কাছে। লুন্দর এক পয়সাও দেয়নি আমাকে.....

আর বলল কী সব মিথ্যে কথা নাকি শুনিয়েছে তোমাকে...

নবিতুনের কথা শেষ হবার আগেই চেঁচিয়ে উঠল কদম, এ্যাদ্দিন—এ্যাদ্দিন এ সব কথা বলিসনি কেন ?

বা—রে, ছোট বৌ কি এ্যাদ্দিন জানতো নাকি ? আমি তো শুনলাম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোটে আজ সকালে। সেই কবে থেকে খবর দিয়েছিল ছোট বৌ, এ্যাদ্দিন যেতে পারলাম কৈ ?

আজ সকালে তুফান মাথায় এ জন্যই ছোট বৌর কাছে গেছিলি ?

নবিতুনের হুঁটা মুখ দিয়ে বেরোবার আগেই আর একটি ঢেউ এল।

সামাল সামাল। নবিতুন, শক্ত করে আঁকড়ে থাক। চেঁচিয়ে উঠল কদম। ঢেউটা ওদের পা ছুঁয়ে গেল।

ওগো আমার চোখে কুটো পড়েছে। কিছুই দেখছি না আমি। তুমি দেখ না শেখ বাড়ীর দোতালার ছাদে শরবতিকে কি দেখা যাচ্ছে। আহা ওর ছেলেটা যে একেবারে বাচ্চা। এক হাতে গাছ ধরে আর এক হাতে চোখ কচলাতে কচলাতে বলে নবিতুন।

কিছু বলল না কদম। শুধু নবিতুনের হাতটা টেনে ইশারা করল দক্ষিণে। এবার একটি নয়, অসংখ্য ঢেউ মার মার করে ছুটে আসছে। আগের দুটোর চেয়ে অনেক উঁচু।

কত উঁচু ? দশ হাত ? পনের হাত ? কুড়ি হাত। না কিছুই আন্দাজ করা যায় না। মনে হয় সারা দুনিয়া জাহান পানি হয়ে উন্মত্তের মতো গর্জে গর্জে ছুটে আসছে। সমুদ্রে সাঁতার-কাটা মানুষ কদম। তারও বুকটা দুরু দুরু কেঁপে যায়।

কদম টেনে নিল নবিতুনের শাড়ীর আঁচলটা। শাড়ীর আঁচলটা নিজের কোমরে বাঁধতে বাঁধতে বলল কদম—নবিতুন শক্ত করে কোমরে গেরো বেঁধেছিস তো ?

নবিতুন বলল, হ্যাঁ।

যদি মরি এক সাথেই মরব, বুঝলি ?

নবিতুন বলল, হ্যাঁ।

নবিতুনের আঁচলটা নিজের কোমরে বাঁধা হয়ে গেলে আক্কির আঁচলটা টেনে নিল কদম। আঁচলটা নবিতুনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, নে এটা বেঁধে নে তোর কোমরে। তিনজন এক সাথেই ভাসব। এ গাছ আর বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না।

আক্কির আঁচলখানা কোমরে বেঁধে নিল নবিতুন।

কদম পরখ করে দেখল আক্কির কোমরের গেরোটা ঠিকমতো রয়েছে কি না। গজরাচ্ছে ফুঁসছে, ফুলে ফুলে উঠছে পানি। ধেয়ে ধেয়ে আসছে কি এক আক্রোশে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার নবিতুন। ওই দেখ আসছে।

এল। একটা দুটো তিনটে—পর পর ঢেউগুলো প্রচন্ড রোষে ছুটে গেল ওদের কোমর ভিজিয়ে।

ইস, নিয়ে গেল শরবতিদের। তীক্ষ্ন আর্তনাদে চিরে গেল নবিতুনের গলাটা।

বানের তোড়ে বসে পড়েছে, ভেসে গেছে লুন্দর শেখের দ্বিতল অট্টালিকা।

সামাল সামাল নবিতুন, বলছে কদম। শালতি শালতি সেই বাহু কদমের। একখানি বাহু গাছের কান্ড আর আক্কির কোমর জড়িয়ে। আর একখানি বাহু নবিতুনের গলায়।

ভয় পেয়েছিস, নবিতুন। শুধাল কদম।

না। বলল নবিতুন।

ওদের পা কিছুতেই আর ডালের সাথে থাকতে চইছে না।

স্রোত ওদের হাঁটুগুলোকে উপড়ে লয়ে ছুটে যেতে চাইছে।

শক্ত হয় নবিতুন। শক্ত করে ধরে রাখে গাছটাকে।

আমায় মাফ করে দিয়েছিস, নবিতুন?

নবিতুন বলল, হ্যাঁ।

ওই দেখ, ওই দেখ আসছে।

এল। আর ওদের মাথার উপর দিয়ে চলে গেল ঢেউটা।

আস্তে করে নেতিয়ে পড়ল গাছটা।

ওরা ভেসে চলল বানের জলে।

ভেসে চলেছে মরা মানুষ, জ্যান্ত মানুষ। আর যাদের পুষত, সেই গরু ছাগল মোষ, হাঁস মুরগি—সবই ভেসে চলেছে। সাগরের পানি জোয়ারের পানি গরকী—যেমন দু'পুরুষ আগে ভাসিয়ে নিয়েছিল ওদের পিতামহদের, তারও আগে ওদের দাদা পিতাদের, আজও ভাসিয়ে নিল ওদের সব কিছু। ওদের ঘরবাড়ী, ওদের আশ্রয়, ওদের বৌ, ওদের প্রেয়সী, ওদের শিশুসন্তান।

পানির মানুষ কদম। ডুবে গিয়েও বুঝি ভেসে উঠল। ভেসে উঠেই চিল্লিয়ে উঠল। নবিতুন, তুই কোথায়?

আক্কি মা? সে কোথায়?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোমরের কাছে হাতটা নিয়ে অনুভব করল কদম। শাড়ীখানা এখনো বাঁধা রয়েছে ওর কোমরে। কিন্তু নবিতুন নেই, আক্কিও নেই। পানির মধ্যে সমস্ত শক্তি দিয়ে শরীরটাকে বুঝি ঝাঁকিয়ে তুলল কদম। অসীম শক্তিতে মাথাটা উঁচিয়ে দেখতে চাইল চারপাশটা, না, দূরে কাছে কাউকেই ভাসতে দেখা যায় না। পানি ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না কোথাও। তবু কদম ডাকল, নবিতুন, নবিতুন। পানির বুক বয়ে ওর কণ্ঠটা কোন্ নির্বোধ অনন্তের দিকে ছুটে গেল কে জানে!

আচমকা একটা ঘূর্ণী এল। কদমকে টেনে নিয়ে গেল নীচের দিকে। শোঁ ও° ও° শোঁ ও° ও°। বাজছে ইস্রাফিলের শিংগা। ছুটে চলেছে পানি। গ্রাম ডুবিয়ে জনপদ ভাসিয়ে বিফল হাহাকার তুলে।

* * *

তারপর এক সময় যেখানকার পানি সেখানেই ফিরে গেল। জেগে উঠল পৃথিবীর মাটি।

পৃথিবীর মাটিতে ঘর নেই, আশ্রয় নেই।

পৃথিবীর মাটিতে এখানে সেখানে মৃত মানুষ—বিবস্ত্র, বিকলাংগ। এখানে সেখানে মৃত পশু।

পৃথিবীর মাটিতে চমৎকার রোদ। সূর্যালোকে খলখলিয়ে হাসছে পৃথিবীটা। বানের জলে ধুয়ে নেয়া পরিষ্কার পৃথিবীর মাটি। আর্সির মতন বুঝি মুখ দেখা যায় এ মাটিতে।

পৃথিবীর বাতাসে শান্ত শীতল কোমল ছোঁয়া।

পৃথিবীর বুকে চিরন্তন সেই সাগর-ঢেউ। ঝিকিমিকি নীলের আনন্দ নৃত্য কলকল গান। বঙ্গোপসাগরের এমন প্রশান্ত আনন্দ কেউ দেখেনি কখনো। পলিপড়া পৃথিবীর মাটির উপর দিয়ে উজ্জ্বল রোদে স্নান করে করে হেঁটে চলেছে দু'জন মানুষ। বড় ক্লান্ত ওরা। ধীর ওদের পদক্ষেপ।

গাছ গাছড়া কোথাও কিছুই নজরে পড়ে না। বুঝি চর অঞ্চল। ঘর বাড়ীর সাথে গাছ গাছালি ধান পাট যা ছিল সে সবও ভেসে গেছে গর্কীর পানিতে। ওরা দুজন। দূরে দূরে। একজন বুঝি আর একজনকে দেখছে না এখনো। ওরা একজন পুরুষ, একজন নারী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এদিকে ওদিকে দেখছে ওরা, দেখছে এদিক ওদিক ছড়ান প্রলয়ের অবশেষ। আর কাকে যেন খুঁজছে ওরা। ওই মৃতদের মধ্যে, খানাখন্দে, অনন্ত বিস্তৃত ধূধূ-র কোন গোপন গহ্বরে।

ওরা যেন পৃথিবীর সেই প্রথম মানব মানবী—বাবা আদম আর বিবি হাওয়া। অকস্মাৎ হৃদয়হীন বিধাতা ওদের ছুঁড়ে দিয়েছে এই রুক্ষ পৃথিবীতে। হঠাৎ করে অপরিচিত ভূমিতে এসে পড়ে ওরা শংকিত, ওরা বিমূঢ়। কে জানে অচেনা যায়গার কোন্ অদৃশ্য সুড়ংয়ে লুকিয়ে আছে কোন্ অজানা শত্রু। তাই দুপাশ দেখে দেখে আস্তে আস্তে চলছে ওরা।

ওরা বুঝি এখনো প্রকৃতির সন্তান। তাই পোশাক নেই ওদের শরীরে। ওরা নগ্ন।

অকস্মাৎ পা টলে পড়ে গেল, পড়ে রইল পুরুষটি। বুঝি আর একজন মৃতের সংখ্যা বাড়ল।

মেয়েটি কিন্তু শক্ত। খুব বেশী টলছে না ও। পাটা ওর আস্তে আস্তে উঠছে আর পড়ছে, একটু বা কাঁপছে। কিন্তু নিশ্চিত তার পদক্ষেপ।

চলতে চলতে পুরুষটির কাছাকাছি এসে পড়ল মেয়েটি। পুরুষটিকে না দেখেই বুঝি চলে যাচ্ছিল ও। যেন হঠাৎই নজর পড়ল। নজর পড়তেই ঝুঁকে এল মেয়েটি। যাকে খুঁজছিল তাকেই পেয়ে গেল ও একান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে।

কী এক আশা আনন্দ আর উৎকণ্ঠায় চেঁচিয়ে উঠল মেয়েটি, কদম, কদম সারেং! কদমের মাথাটা কোলে তুলে নিল নবিতুন।

কদম চোখ মেলেই আবার চোখ বুজল। বলল, পানি।

পানি? দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক দেখল নবিতুন। দেখল একটু দূরে খাদ মতন একটি জায়গায় চিকচিক করেছে পানি। দ্রুত পায়ে ফিরে এল।

কিন্তু মুখে যেতে না যেতেই থুক থুক করে পানিটা ফেলে দিল কদম। বিকৃত বিরক্ত মুখে কী যেন বলল। ঠোঁট দুটো চেপে রাখল। মুখটা ঘুরিয়ে নিল কদম।

কি হল? একটা ঢোক খাও! বলতে গিয়েই মনে পড়ল নবিতুনের সাগরের পানিতে কখনো তৃষ্ণা মেটে না মানুষের। তবু বুঝি আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একবার যাচাই করার জন্যই কোশে ধরা পানির অবশিষ্ট টুকু মুখে পুড়ে নিল নবিতুন। ইস। মুখটা বুঝি পুড়েই গেল। তাড়াতাড়ি পানিটা মুখ থেকে ফেলে দিল নবিতুন। এত লোনাও হয় পানি ?

কিন্তু, কদম যে পানি চেয়েছে ? তেষ্টায় দুর্বলতায় নেতিয়ে পড়েছে ও। পানি না পেলে কেমন করে বাঁচবে কদম !

অজানতেই নবিতুনের চোখ জোড়া ঘুরে গেল সাগরের দিকে। সাগরে আজ গর্জন নেই, হুঙ্কার নেই, সাগরে শুধু নীলানন্ত তরঙ্গের চপল নৃত্য। তবু চমকে ওঠে নবিতুন। দৃষ্টিটাকে ফিরিয়ে আনে কদমের দিকে। এই সাগর নবিতুনের চিরকালের শত্রু।

মুহূর্তের বেশী ইতস্তত করল না নবিতুন। কদমকে কোলে নিয়ে বুকের কাছে তুলে আনল কদমের মুখ। সে মুখে পরম যত্নে পুরে দিল স্তনের বোঁটা।

বুঝি স্তন চুষবার শক্তিটাও নেই কদমের শরীরে। নবিতুন স্তনটা টিপে টিপে দুধ ঝরিয়ে দিল কদমের মুখে। তারপর স্তনের বোঁটাটা পুরে রাখল ওর মুখের ভেতর। শিশুর মতন নবিতুনের বুকটা আঁকড়ে থাকল কদম। উদার আকাশে বুঝি আজ অনেক স্নেহ। উদার আকাশটা সূর্য-স্নেহমাখা হাতে প্রলয় বিধ্বস্ত এ পৃথিবীর ক্ষতে বুলিয়ে চলেছে প্রীতি-উষ্ণতার আরোগ্য-পরশ। বুঝি মুছে দেবে সব ক্ষত, সব ক্ষতি।

আনন্দে বিস্ময়ে ক্লান্তিতে এখনো কাঁপছে নবিতুন। কাঁপা হাতে বুকের উপর ধরে রেখেছে কদমের মুখখানি। অনিমিষ চেয়ে চেয়ে দেখছে নবিতুন, কদমের মুখে ফুটে উঠেছে প্রাণের আভাস, ওর কপালের শিরায়, ওর খোঁচা খোঁচা দাড়ির অন্তরালে মুখের ত্বকে ধীর রক্ত চলাচলের ক্ষীণ দ্যুতি।

বুঝি সৃষ্টির সেই প্রথম নারী, আপন আধারে সুপ্ত বিপুল শক্তির সহসা আবিষ্কারে বিস্মিত অভিভূত—তেমনি চোখে চেয়ে চেয়ে দেখছে নবিতুন। আর বুঝি আপনার মাঝে সদ্য-অনুভূত সঞ্জীবনী জীবনধারার অসহ্য আবেগে কেঁপে উঠছে, দুলে উঠছে বার বার।

অনিমিষ চেয়ে চেয়ে দেখছে নবিতুন। মুমূর্ষ কদমের দেহে ফিরে আসছে জীবন। হাত নড়ছে। পা নড়ছে। বুঝি ফোঁটা ফোঁটা শক্তির সঞ্চারে ধীরে ধীরে জেগে উঠল কোন মৃত মানুষ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু জেগে উঠেই নবিতুনকে আকস্মিক ধাক্কায় দূরে ঠেলে দিল কদম। কী এক বিভ্রান্ত উন্মাদ চোখে নবিতুনের মুখে মুহূর্তের জন্য কি যেন খুঁজল। দুর্বল কম্পিত পায়ে উঠে দাঁড়াল। চেঁচিয়ে উঠল—পর করে দিলি ? পর করে দিলি নবিতুন ?

পর ? কেন ? বিমূঢ় জিজ্ঞাসা নবিতুনের।

এ কী করেছিস ? একি করেছিস নবিতুন ? পর করে দিলি ? এমন দুষমনি করলি ?

দুষমনি ?

তুই কি জানিস না বৌ-র দুধ—

কথাটা শেষ করতে পারল না কদম। উত্তেজনার ক্লান্তিতে টলতে টলতে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলো মাটিতে।

ওই মুমূর্ষ দেহে কতটুকু শক্তিই বা সঞ্চারিত করতে পেরেছিল নবিতুন। হয়ত নিষ্ঠুর মর্মান্তিক ওই কয়টি কথা উচ্চারণ করার মতো শক্তি। তার বেশি নয়। কথার মাঝখানেই ফুরিয়ে গেছে নবিতুনের দেহ থেকে পাওয়া ওইটুকু শক্তি।

উঠে বসল নবিতুন। ঝুঁকে এল। আবারও কোলের উপর তুলে নিল কদমের মাথাটা। কদম নিষ্কম্প। ফেনা ঝরছে মুখ দিয়ে। চোখ বোজা। নবিতুন ডাকল—কদম।

নবিতুনের ডাক জনহীন বৃক্ষহীন পলির প্রান্তরে আছড়ে পড়ল। হারিয়ে গেল অথৈ সমুদ্রের দূর বিস্তারে। পেঁছিল না কদমের কানে।

বামনছাড়ির সারেং বৌ নবিতুন। কুটনার কুমন্ত্রণা, বালাখানার প্রলোভনের মুখে যে ছিল শক্তিমতি নারী। লুন্দর শেখের শয়তানী আর লালসার সুমুখে যে ছিল এক ফুলকি আগুন। অনাহার দুর্ভোগ আর ক্ষণিকের তরে সন্দেহ বিভ্রমে উন্মাদ-হওয়া আপন মানুষটির ধিক্কারের মুখেও যে ছিল ধৈর্যবতী বসুন্ধরা। মহাপ্রলয়ের অতল গহ্বর থেকে, সহস্র ঘূর্ণাবর্তের অন্ধকার ফুঁড়ে যে উঠে এল সূর্যস্নান পলি-মাটির স্নিগ্ধ জীবনের রাজ্যে। ক্ষিপ্ত সাগরের সেই আসমান-উঁচু প্রলয়-ঙ্করী তরঙ্গের টুঁটি টিপে জীবনকে যে ছিনিয়ে আনল। সেই নবিতুনের বুকের আধারে এখনো তো কতো শক্তি। কতো সুধা! ওই সুধার নির্ঝর ঢেলে কেন আপন প্রিয়তমকে বাঁচিয়ে তুলতে পারে না ও ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেন ? কেন ? মাথার ওপরে আকাশটাকেই যেন শুধাল নবিতুন।

আকাশ নিরুত্তর।

শুভ্রমুখীর কাজল চোখের মত টুকরো মেঘ সাদা আকাশে। সে-দিকেই থমকে থাকে নবিতুনের চোখ। সেখানে কি কোন প্রত্যাশা ?

নবিতুনের কোলে যেমনটি ছিল তেমনি নিথর নিষ্কম্প কদম। শুধু দুপাশে চরম কোন হতাশার মতো ছড়িয়ে থাকা হাতের কটি আঙ্গুল একটু একটু নড়ছে। সে আঙ্গুল দুর্বল সঞ্চালনের নরম পলির মাঝেই কী যেন খুঁজছে। কদমের বুকে হাত রাখল নবিতুন। হাতের স্পর্শে কিছু বোঝা যায় না। মাথাটা ঝুঁকিয়ে আনল নবিতুন। কান পেতে শুনল কদমের বুকের স্পন্দন। ক্ষীণ অতি ক্ষীণ সে স্পন্দন। কতক্ষণ। আর কতক্ষণ বাঁচবে কদম ? নবিতুনের অনুক্ত প্রশ্নের জবাবেই যেন চোখ মেলল কদম। অনেক কষ্টে চোখের অর্ধেকটুকু মেলল ও। সে চোখে কী এক মিনতি, কী এক তিরস্কার।

কেন ? কেন ? বাতাস চিরে চিল্লিয়ে উঠল নবিতুন।

কেন এই তিরস্কার ! কিসের এই মিনতি।

এমনি সময়। নবিতুনের চীৎকার তখনো বাতাস চিরে ধেয়ে চলেছে। শুভ্রমুখীর কাজল চোখ ঝরে যেন এল অমৃতের ধারা। আকাশ জুড়ে বৃষ্টি নামল।

জোড়া হাতের কোশ মেলে বৃষ্টি ধরল নবিতুন। কদমের ঠোঁটে ঢেলে ঢেলে দিল ফোঁটা ফোঁটা। বৃষ্টির পানি, ঠান্ডা আর মিষ্টি। সে পানিতে গলা ভিজল, পেট ভরল কদমের।

কদমের মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ির ফাঁকে কাদামাটি। ভিজা হাতে ডলে ডলে মুখটা ওর ধুইয়ে দিল নবিতুন। কদমের চুলের জটায় চটচটে কাদা। ধীরে ধীরে আঙ্গুল চালিয়ে জটাগুলো ছাড়িয়ে দিল নবিতুন। বৃষ্টির ধারায় ধুইয়ে দিল মাথার চুল। তারপর আঙ্গুল টেনে টেনে কেটে দিল কদমের প্রিয় তেড়ি।

বৃষ্টি পড়ল অনেকক্ষণ। যতক্ষণ না নিঃশেষ হল মেঘটা ততক্ষণ। আর যতক্ষণ বৃষ্টি পড়ল বুঝি বৃষ্টির সাথে পাল্লা দিয়েই ঝরে পড়ল সূর্যের আলোকধারা। এমন অমৃত-বারি আর কখনও বুঝি নেবে আসেনি পৃথিবীতে। পৃথিবীর বুকে রোদ-বৃষ্টির এমন মিতালি আর কেউ দেখেনি কখনো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুখ তুলে চোখ মেলে কদম। আশ্চর্য এই পৃথিবীর সাথে যেন এই প্রথম দৃষ্টি বিনিময় ওর। উঠে বসল কদম।

আজকের স্নেহভরা ওই আকাশটা বৃষ্টির ধারায় আলোর সুধায় আপ্লুত এই বিশ্ব চরাচর যেন নবিতুনের চোখের কোলে ঠাঁই নিয়ে হেসে উঠল। নবিতুনের মুখে সদ্যজাগা পলির স্নিগ্ধতা, বিজয়িনীর গৌরব।

তারপর উঠে দাঁড়াল ওরা। হেঁটে চলল।

হাঁটতে গিয়েই ওরা দেখল ওরা নগ্ন। লজ্জা পেয়ে দু'জন দু'দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল। গন্ধম উদ্যানে প্রথম প্রেমের লগ্নে তরুণ আদম আর বিবি হাওয়া নগ্নতার চকিত প্রকাশে এমনি করেই বুঝি লজ্জাকে আবিষ্কার করেছিল।

মুখ ঘুরিয়ে দেখল হাত কতক দূরে অগভীর ডোবা মতন জায়গা। সেখানে এক জোড়া মরা মানুষ। একজনের কোমরে জড়িয়ে আছে তবন।

গরুকির পানি প্রাণটা ওর কেড়ে নিয়েছে কিন্তু পারেনি পরনের তবনটা ভাসিয়ে নিতে।

মরা লোকটার তবনটা খুলে নিল কদম। তবনটাকে ছিঁড়ে ফেলল দু টুকরোয়। এক টুকরো প্যাঁচিয়ে নিল নিজের কোমরে। বাকী টুকরোটা বাড়িয়ে দিল নবিতুনের দিকে।

ভাল করে দিকটা দেখল কদম। দেখল চরের দূরপ্রান্তে সবুজ রেখা। আর দেখল কয়েক হাত দূরে বঙ্গোপসাগরের ঝিলমিলি নীল। শান্ত সংযত আর সুন্দর।

কদম বলল, আর একটু জিরিয়ে নেরে নবিতুন। হাঁটতে হবে অনেক দূর।

কেন্দ্রীয় কারাগার, ঢাকা।
১৪ আশ্বিন, ১৩৬৮
১লা অক্টোবর, ১৯৬১

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~